এডুকেশন ওয়াচ ২০০৮

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

প্রকাশনায়

গণসাক্ষরতা অভিযান

এডুকেশন ওয়াচ ২০০৮

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা
অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জসমূহ

মূল প্রতিবেদনের বাংলা সারসংক্ষেপ

সমীর রঞ্জন নাথ
আহমদ মোশ্‌তাক রাজা চৌধুরী

নভেম্বর ২০০৯

গণসাক্ষরতা অভিযান

যোগাযোগ ঠিকানা
গণসাক্ষরতা অভিযান
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
ফোন: ৯১৩০৪২৭, ৮১৫৫০৩১, ৮১৫৫০৩২
ইমেইল: info@campebd.org
ওয়েবসাইট: www.campebd.org

ক. ভূমিকা ও উদ্দেশ্য

নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ ও বাস্তবভিত্তিক নীতিমালা সুপারিশের মাধ্যমে 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে অবদান রাখার প্রয়াসে ১৯৯৮ সালে *এডুকেশন ওয়াচ*-এর যাত্রা। শুরুর দিকে কয়েক বছর *ওয়াচ* প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষা এবং সাক্ষরতা পরিস্থিতি অনুসন্ধানে নিয়োজিত ছিলো। পরবর্তী বছরগুলোতে মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার মানোন্নয়নের বৃহত্তর স্বার্থে এর প্রথম তিনটি প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা, শিক্ষার্থীদের মৌলিক ও প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণের অবস্থা যাচাইয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। প্রতিবেদনগুলো শিক্ষাসংশ্লিষ্ট নানা মহলে ব্যাপক সাড়া জাগায়। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতাভিত্তিক শিখন দক্ষতা পরিমাপ ও বিশ্লেষণে *এডুকেশন ওয়াচ*-ই সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করে।

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি ও জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বাংলাদেশ অনেকদূর এগিয়েছে। বর্তমানে মান উন্নয়নই প্রাথমিক শিক্ষার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। *এডুকেশন ওয়াচ*-এর পূর্ববর্তী প্রতিবেদনগুলোসহ অন্যান্য অনেক গবেষণাপত্রে প্রাথমিক শিক্ষার নিম্নমানের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানসংক্রান্ত *ওয়াচ*-এর প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশের পর বেশ কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ঐ প্রতিবেদন প্রকাশের পর সরকারসহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার মধ্যে দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-২) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান পুনরায় যাচাইয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এর ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষার মানে কী ধরনের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা যেমন বোঝা যাবে, তেমনি শিক্ষাসম্পর্কিত কৌশল পুনঃপর্যালোচনা ও পরিকল্পনার সুযোগও সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ পাঁচ বছর, ৬-১০ বছরের শিশুরা বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার অভীষ্ট জনগোষ্ঠী। সারা দেশে ১০ ধরনের প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে তিনটি ভিন্ন শিক্ষাক্রম অনুসরণ করা হয়। সরকারি বিদ্যালয়, বেসরকারি (নিবন্ধিত ও অনিবন্ধিত) বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়, পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। এবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং উচ্চ-মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলো বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের

শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো ব্রিটিশ শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে আবার প্রশাসনিক দায়িত্বের নিরিখে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের প্রধান সরকারি প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রথম পাঁচ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তদারকি করে। পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়গুলোতে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীর কিছুটা কর্তৃত্ব রয়েছে, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলো বাস্তবায়নকারী সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় এবং উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর তদারকিতে পরিচালিত হয়। মাদ্রাসাগুলো মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের নিয়ম অনুসরণ করে এবং ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর জন্য নির্দিষ্ট কোনো কর্তৃপক্ষ নেই।

মানসম্মত শিক্ষার ধারণা একটি ব্যাপক পরিব্যাপ্ত বিষয়; শিক্ষাব্যবস্থায় যে কোন ধরনের পরিবর্তন শিক্ষার মানের ওপর প্রভাব ফেলে। আবার মানসম্মত শিক্ষার সর্বোচ্চ সীমা বলেও কিছু নেই। শুধু উন্নয়নশীল দেশগুলোতেই নয়, ধনী ও উন্নত দেশগুলোতেও মানসম্মত শিক্ষার প্রশ্নটি ব্যাপকভাবে আলোচিত। জমতিয়েন সম্মেলন ও ডাকার ফোরামসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে মানসম্মত প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার ওপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। একদশকেরও বেশি আগে ইউনেস্কো'র জাক দেলর কমিশন শিক্ষাকে জীবনব্যাপী শিখনের প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছিলো যা মূলত চারটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত– *জানার জন্য শেখা*, *বাঁচার জন্য শেখা*, *মিলেমিশে বসবাস করতে শেখা* এবং *বিকশিত হওয়ার জন্য শেখা*। মানসম্মত শিক্ষা পরিমাপ ও পর্যালোচনার জন্য বেশ কিছু ফ্রেমওয়ার্ক বা কাঠামো রয়েছে যার মধ্যে *জোগান-প্রক্রিয়া-তাৎক্ষণিক ফল* কাঠামোটি (পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন) বহুল ব্যবহৃত। বর্তমান গবেষণায় এ কাঠামোটি ব্যবহার করা হয়েছে। এই ফ্রেমওয়ার্কের তিনটি উপাদানের প্রতিটিতে অনেকগুলো সূচক রয়েছে। উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মানসম্মত শিক্ষা নিরীক্ষার জন্য নানা ধরনের সূচকের সমন্বয়ে দুটি তালিকা তৈরি করেছে; এগুলো হলো, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের স্তর (পিএসকিউএল) ও মুখ্য দক্ষতা সূচক (কেপিআই)। তালিকাদুটির প্রায় সবগুলো সূচকই *জোগান-প্রক্রিয়া-তাৎক্ষণিক ফল* কাঠামোর মধ্যে রয়েছে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণমূলক কাঠামোকে ভিত্তি ধরে *এডুকেশন ওয়াচ ২০০৮*-এর গবেষণার জন্য নিচের চারটি উদ্দেশ্য গ্রহণ করা হয়:

১. প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মানের স্তর ও মূখ্য দক্ষতা সূচকসহ মানসম্মত শিক্ষার বিবিধ পরিমাপকের নিরিখে প্রাথমিক ও মৌলিক শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বাংলাদেশ কতটা অগ্রগতি লাভ করেছে তা পরিমাপ করা;

২. শিক্ষার্থীদের শিখনফল অর্জনের সাথে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থাসহ মানসম্মত শিক্ষার নানা সূচকের (জোগান ও প্রক্রিয়া উভয়েই) সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা;

৩. শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ পরিস্থিতির অগ্রগতি, এর সহসম্পর্কিত বিষয়সমূহ এবং অংশগ্রহণসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতাগুলো অনুসন্ধান করা;

৪. জনগণের শিক্ষা ও সাক্ষরতার বর্তমান স্তর সম্পর্কে জানা এবং সময়ের আবর্তে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের সাথে এ সংক্রান্ত কী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে তা অনুসন্ধান করা।

মানসম্মত শিক্ষা বিশ্লেষণের ফ্রেমওয়ার্ক

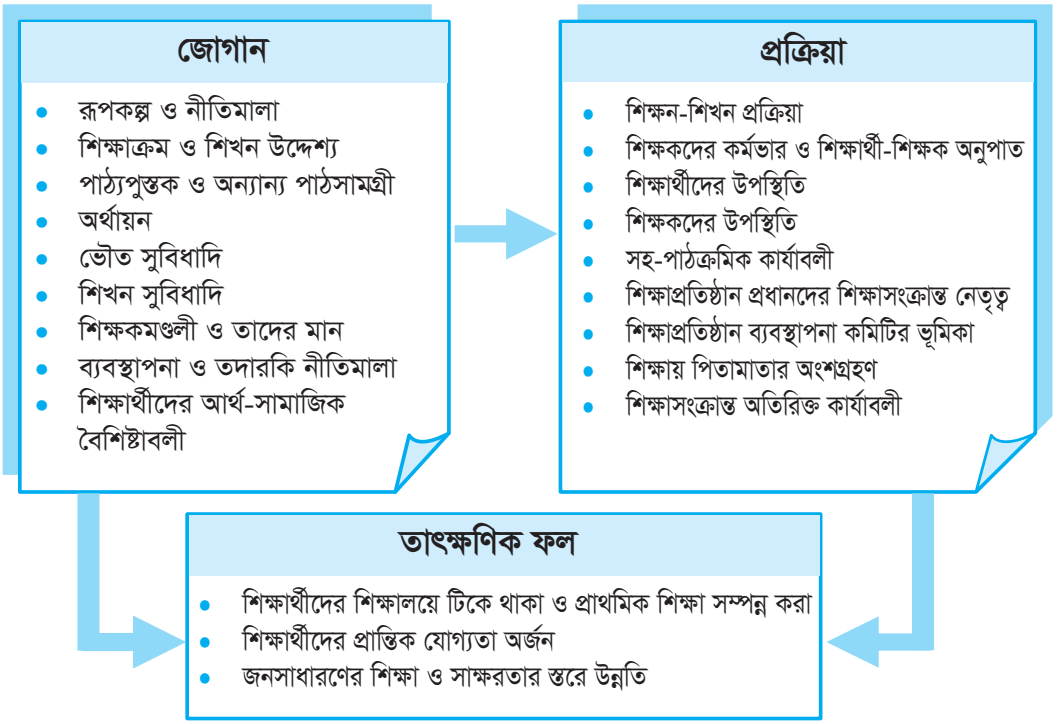

খ. গবেষণা পদ্ধতি

প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান মান বোঝার জন্য এই গবেষণায় মাঠপর্যায় থেকে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি গত এক দশকের অগ্রগতি বোঝার জন্য পূর্ববর্তী *এডুকেশন ওয়াচ*সমূহের তথ্যভাণ্ডারও (১৯৯৮, ২০০০ ও ২০০৫ সালে সৃষ্ট) ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার প্রথম দুটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও খানা জরিপের আশ্রয় নেওয়া হয়। খানা জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষণার তৃতীয় ও চতুর্থ উদ্দেশ্য পূরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রান্তিক যোগ্যতার নিরিখে শিক্ষার্থীদের অর্জন অভীক্ষা নেওয়া হয়। *এডুকেশন ওয়াচ*

২০০০-এর জন্য যে অভীক্ষাপত্রটি তৈরি করা হয়েছিলো এই গবেষণায়ও সেটি ব্যবহার করা হয়েছে। অভীক্ষাটিতে ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে ২৭টি প্রতিফলিত হয়েছে। পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনের ঠিক পূর্বমুহূর্তে ২০০৮ সালের নভেম্বরে এই অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রচলিত ১০ ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে এই গবেষণার জন্য ছয় ধরনের প্রতিষ্ঠান নেওয়া হয়। এগুলো হলো, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবতেদায়ি মাদ্রাসা, উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চ-মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা। গ্রাম ও শহরের বিদ্যালয়গুলোকে আলাদাভাবে বিবেচনা করে বিদ্যালয় জরিপের জন্য সর্বমোট ১২টি স্ট্র্যাটা বিবেচনা করা হয়। গবেষণায় প্রতিটি স্ট্র্যাটা থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে ৩০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাছাই করে প্রতিটি প্রতিষ্ঠান থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ২০ জন শিক্ষার্থীর অভীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু শহরাঞ্চলে এবতেদায়ি মাদ্রাসার অপ্রতুলতার কারণে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে নির্ধারিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর অভীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয় নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে পঞ্চম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীসংখ্যা কম থাকায় সংশ্লিষ্ট ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে হয়েছিলো। সর্বমোট ৪৪০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ৭,০৯৩ জন শিক্ষার্থীর প্রান্তিক যোগ্যতা পরিমাপক অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়, যাদের মধ্যে ৭,০৭০ জনের আর্থসামাজিক অবস্থার তথ্যও সংগ্রহ করা হয়।

শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ ও বিদ্যালয়-বহির্ভূত শিশুদের অবস্থা জানা এবং এ-সম্পর্কিত আর্থসামাজিক অবস্থা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে খানা জরিপ করা হয়। এজন্য পূর্ববর্তী *এডুকেশন ওয়াচ*গুলোর পদ্ধতি অনুসরণ করে সারা দেশকে ছয়টি গ্রামীণ ও দুটি শহর– মোট আটটি স্ট্র্যাটায় ভাগ করা হয়। গ্রামীণ এলাকাগুলো হলো– ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল; আর শহর এলাকাগুলো হলো– সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা। গবেষণার পরিকল্পনা অনুসারে প্রতিটি স্ট্র্যাটায় ১২০টি গ্রাম/মহল্লা থেকে ৩০০০টি করে খানা জরিপ করার কথা থাকলেও কিছু নির্বাচিত গ্রাম/মহল্লায় খানাসংখ্যার অপ্রতুলতার কারণে গ্রাম/মহল্লার সংখ্যা বাড়াতে হয়েছিলো। শেষ পর্যন্ত ১,০০৩টি গ্রাম/মহল্লা থেকে ২৪,০০৭টি খানা জরিপ করা হয়। এই খানাগুলোর মোট জনসংখ্যা ছিলো ১,১৩,৩২০ জন যার মধ্যে ১৪,৬৮৮ জন প্রাথমিক স্তরে ভর্তির উপযুক্ত বয়সী (অর্থাৎ ৬-১০ বছরের মধ্যে) এবং ১৫,১৮৯ জন প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থী।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক তৈরি করা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরিপের জন্য নমুনা সংগ্রহ করা হয়। অপরদিকে খানাজরিপের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তৈরি করা

জেলাভিত্তিক গ্রাম/মহল্লার তালিকা ব্যবহার করা হয়। ২০০৮ সালের মধ্য-অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সমুদয় তথ্যসংগ্রহের কাজ সম্পন্ন করা হয়।

গ. প্রধান ফলাফল

শিক্ষাসংক্রান্ত সুযোগসুবিধা এবং শিখন-সংস্থান

যেকোন শিক্ষাব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ হলো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে উপযুক্ত মানের সুযোগসুবিধা তৈরি করা। ১৯৯৮ সালের অবস্থার সঙ্গে বর্তমান জরিপের ফলাফল তুলনা করে এ-সম্পর্কিত অগ্রগতিসমূহ এখানে উল্লেখ করা হলো:

- সামগ্রিকভাবে গত ১০ বছরে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভৌত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা, ভবন নির্মাণ উপাদানের গুণগতমান, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী ধারণক্ষমতার নিরেখে এই অগ্রগতি লক্ষ্য করা গেছে।

- শ্রেণীকক্ষের সংখ্যার বিচারে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো অন্যদের চেয়ে এগিয়ে থাকলেও নির্মাণ উপাদানের গুণগতমানের দিক দিয়ে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো অবস্থা ভালো। ১৯৯৮ সালে সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণীকক্ষের সংখ্যা ছিলো গড়ে ৩.৮টি যা ২০০৮ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ৪.৬টিতে। ১৯৯৮ সালে সামগ্রিকভাবে বিদ্যালয়গুলোর এক-তৃতীয়াংশ স্থাপনা ছিলো পুরোপুরি ইট দিয়ে তৈরি যা ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০%-এ উন্নীত হয়েছে। ১৯৯৮ সালে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে যথাক্রমে ৪৪.৫% ও ৪৭.৯% পুরোপুরি ইটের স্থাপনা ছিলো যা ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৭.৬% ও ৯০%-এ উন্নীত হয়েছে। অধিকাংশ শ্রেণীকক্ষের অবস্থা বর্তমানে ভালো থাকলেও কিছু কিছু শ্রেণীকক্ষ নানাধরনের বিপর্যস্ত অবস্থায় রয়েছে।

- খাবার পানির উৎস হিসেবে ১৯৯৮ সালে ৪৭% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাইপের মাধ্যমে পানি সরবরাহ বা নলকূপের ব্যবস্থা ছিলো যা ২০০৮ সালে ৫৩.৮%-এ উন্নীত হয়েছে। এই উন্নতি সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে সরকারি বিদ্যালয়ে (১৮.৭% পয়েন্ট), তারপর বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোতে (১৩% পয়েন্ট)। সামগ্রিকভাবে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাদের প্রতিবেশী পরিবার বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে খাবার পানির সুবিধা গ্রহণ করে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো হয় কলসিতে পানি সংরক্ষণ করে বা তাদের খাবার পানির কোন সুবিধা নেই।

- ১৯৯৮ সালে এক-চতুর্থাংশেরও কম সংখ্যক সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিলো, যা ২০০৮ সালে বেড়ে যথাক্রমে ৫০.৭% এবং ৪২.৯%-এ উন্নীত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে ৭০% শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য শৌচাগার সুবিধা পাওয়া গেছে, যার অর্ধেকে ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা রয়েছে। এক-পঞ্চমাংশ বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার দেখা গেছে আর ৩৫.৭%-এর ক্ষেত্রে তা মাঝারি মানের।

- ২০০৮ সালে মাত্র ১৬% বিদ্যালয়ে শারীরিক প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য অবকাঠামোগত সুবিধা পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে সরকারি বিদ্যালয়গুলো (৩৪.২%) অন্যদের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য শৌচাগারের ব্যাবস্থা খুবই নগণ্য।

- ১৯৯৮ সালে প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের দুই-তৃতীয়াংশ শ্রেণীকক্ষে স্বচ্ছন্দে বসতে পারতো যা ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৯০%-এ উন্নীত হয়েছে। দুটি কারণে এটি হতে পারে– ১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে গড়ে প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থী সংখ্যা ৪৮ জন থেকে কমে ৪১ জন হয়েছে; অন্যদিকে, ১৯৯৮ সালে প্রতি শ্রেণীকক্ষে গড়ে ৩১ জনের বসার সংস্থান ছিলো যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ৩৭ হয়েছে। এবতেদায়ি মাদ্রাসা ছাড়া অন্য সব ধরনের বিদ্যালয়ে এই অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিদ্যালয়ের ধরন ও সাল অনুসারে স্বাভাবিকভাবে বসতে পারে এমন শিক্ষার্থীদের হার

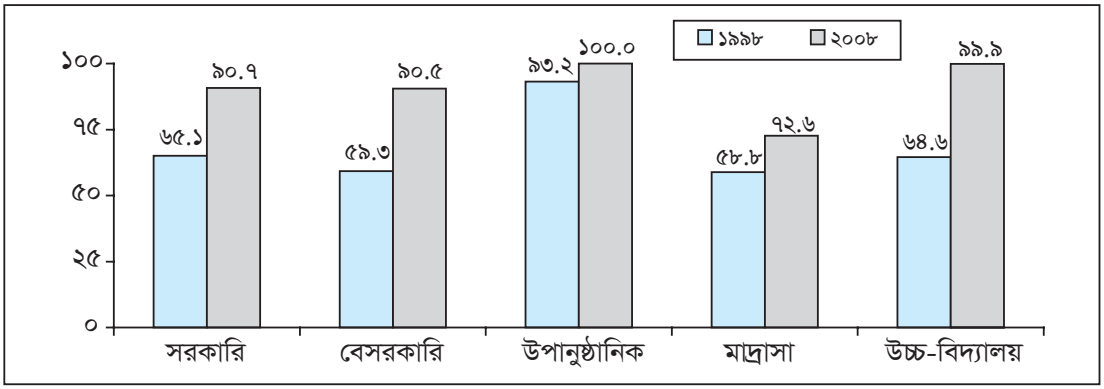

- প্রায় ৮০% প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খেলার মাঠ থাকলেও মাত্র ৮.৫% বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান দেখা গেছে। উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ-মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসা এই দিক দিয়ে এগিয়ে আছে। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোতে উভয় ধরনের সুযোগসুবিধার অভাব রয়েছে।

- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন অনুসারে ভিন্নতা থাকলেও গড়ে প্রায় ৪০% প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। অন্যদিকে মাত্র এক-চতুর্থাংশ শ্রেণীকক্ষে বৈদ্যুতিক বাতি

ও পাখা রয়েছে। এক্ষেত্রে উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো ভালো অবস্থানে রয়েছে। সবচেয়ে পিছিয়ে রয়েছে মাদ্রাসা ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলো। স্বাভাবিক সময়ে, বিদ্যালয়ের ধরন নির্বিশেষে প্রায় সব শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক আলো ও বাতাসের প্রবাহ ছিলো।

- ২০০৮ সালে তিন-পঞ্চমাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মেঝে ও বারান্দা জরিপের দিন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাওয়া গেছে। প্রায় এক-পঞ্চমাংশ প্রতিষ্ঠানের মেঝে এবং বারান্দায় ধুলাবালি এবং বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোতে ধুলাবালি ও ময়লা কাগজ উভয়ই পাওয়া গেছে। তিন-পঞ্চমাংশের বেশি শ্রেণীকক্ষের দেয়াল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পাওয়া গেছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এগিয়ে রয়েছে।

- স্পষ্টভাবে লিখতে পারার নিরিখে প্রায় ৮০% শ্রেণীকক্ষের ব্ল্যাকবোর্ডের অবস্থা খুবই ভালো। নব্বই শতাংশ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ব্ল্যাকবোর্ড এবং ৮০% উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্ল্যাকবোর্ডের অবস্থাও খুবই ভালো। এবতেদায়ি মাদ্রাসাগুলোতে মাত্র ৪৪% ব্ল্যাকবোর্ড ভালো পাওয়া গেছে।

- শিক্ষার্থীদের মানন্নোয়নের জন্য প্রায় ১৬% শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সাধারণ কোচিং-এর ব্যবস্থা করে আর ৫২% প্রতিষ্ঠান শুধু প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের কোচিং করিয়ে থাকে। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলো যেখানে সব শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীর জন্য সাধারণ কোচিং-এর ব্যবস্থা করে যেখানে অন্য ধরনের বিদ্যালয়গুলো বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের কোচিং-এর ওপর গুরুত্ব দেয় বেশি। প্রায় ৯০% সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে বৃত্তি পরীক্ষার্থীদের কোচিং করানো হয়। গবেষণাভুক্ত ১৮.৪% শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এ-ধরনের অতিরিক্ত কোচিং-এর জন্য ফি নিয়ে থাকে; এদের অধিকাংশই উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ।

- শ্রেণী, জেন্ডার বা বিদ্যালয়ের ধরন নির্বিশেষে টাকার বিনিময়ে প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়ার হার গত এক দশকে বেড়েছে। সার্বিকভাবে ১৯৯৮ ও ২০০০ সালে এক-পঞ্চমাংশের সামান্য কিছু বেশি শিক্ষার্থীর গৃহশিক্ষক ছিলো যা ২০০৫ ও ২০০৮ সালে বেড়ে যথাক্রমে ৩১% ও ৩৮% হয়েছে। মেয়ে শিক্ষার্থীরা তাদের ছেলে সহপাঠীদের তুলনায় এবং গ্রামীণ এলাকার শিক্ষার্থীরা শহর এলাকার শিক্ষার্থীদের তুলনায় কম প্রাইভেট টিউটর সুবিধা পেয়ে থাকে। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় ও উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এদিক দিয়ে অন্য ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তুলনায় এগিয়ে আছে। এই দুই ধরনের বিদ্যালয়ের

দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি শিক্ষার্থী গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাত্র ১২% গৃহশিক্ষকের কাছে পড়ে। ২০০৮ সালে পঞ্চম শ্রেণীর প্রায় ৫৩% শিক্ষার্থীর গৃহশিক্ষক ছিলো।

এলাকা ও সাল অনুসারে গৃহশিক্ষকের সাহায্য নেওয়া শিক্ষার্থীদের হার

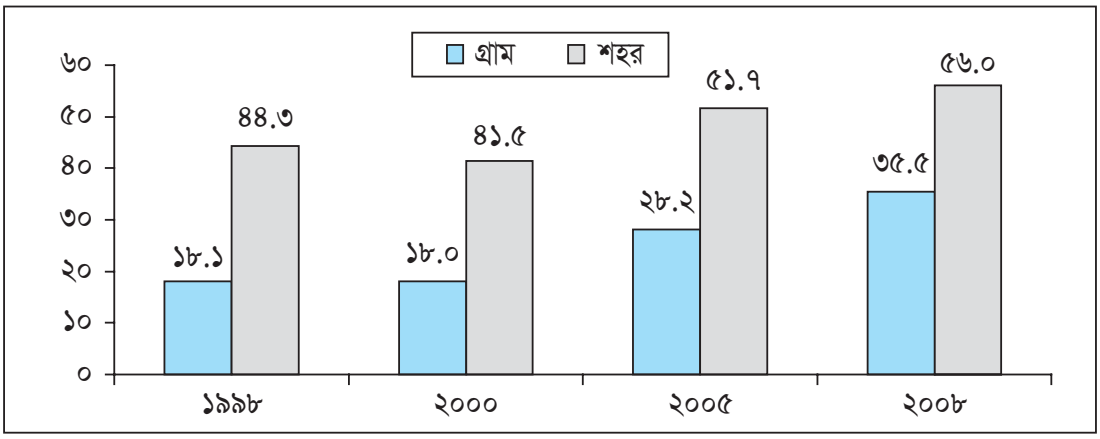

- চারুকলা, গান ও নাচ উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়সমূহের একটি অত্যাবশ্যক অংশ। অন্য ধরনের বিদ্যালয়গুলোর প্রায় অর্ধেকে চারু ও কারুকলার ক্লাস করানো হয়। ২০০৮ সালে ৫৩.৪% বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অর্ধেকেরও কম বিদ্যালয়ে কাব কার্যক্রম রয়েছে। খুব কম সংখ্যক মাদ্রাসাতেই বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, কাব কার্যক্রম বা চারুকলা-সম্পর্কিত ক্লাস করানো হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে কোনো কাব কার্যক্রম বা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নি।

- সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৯৮ সালে গড়ে ৪.৪ জন শিক্ষক ছিলো যা ২০০৮ সালে বেড়ে ৫.২ জন হয়েছে। গত এক দশকে বেসরকারি বা উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যায় কোনো পরিবর্তন দেখা যায় নি। ১৯৯৮ সালে সার্বিকভাবে নারী শিক্ষকের সংখ্যা ছিলো মোট শিক্ষকদের এক-তৃতীয়াংশেরও কম যা ২০০৮ সালে বেড়ে ৩৯.৩% হয়েছে। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের প্রবিধানই হচ্ছে নারী শিক্ষক নিয়োগ করা। উভয় জরিপেই এ ধরনের বিদ্যালয়গুলোতে সর্বোচ্চ অনুপাতে নারী শিক্ষক পাওয়া গেছে। সবচেয়ে কম নারী শিক্ষক রয়েছে মাদ্রাসায় (১০.৫%)। সরকারি ও উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নারী শিক্ষকের হারে বেশ উন্নতি ঘটেছে। তবে গ্রামীণ এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর চেয়ে শহর এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী শিক্ষকের হার অনেক বেশি (যথাক্রমে ৩৬.৬% ও ৫৭.৪%)।

- গত এক দশকে শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রেও উন্নতি দেখা যাচ্ছে। ১৯৯৮ সালে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের এক-চতুর্থাংশ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কিছু সংখ্যক শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিলো মাধ্যমিকেরও নিচে। ২০০৮ সালে কোন প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই এত কম পড়ালেখা জানা শিক্ষক পাওয়া যায় নি। ১৯৯৮ সালে স্নাতকোত্তর পাশ শিক্ষকের হার ছিলো ১৪.৪% যা ২০০৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮.৯% হয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতার নিরিখে নারী শিক্ষকরা পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায় পিছিয়ে আছেন।

- সরকারি, বেসরকারি ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ৮৫% বা তার বেশি শিক্ষকের, মাদ্রাসার ১১%-এরও কম ও উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫৬% শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণ রয়েছে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অবস্থা গত দশ বছরে বেশ ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে– ১৯৯৮ সালে ২৫.৯% থেকে বেড়ে ২০০৮ সালে ৮৬.৮% হয়েছে।

- অর্ধেকেরও কম শিক্ষক এক বা একাধিক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। মোট শিক্ষকদের ১৯.২% বাংলা, ২২.১% ইংরেজি, ২৩.৪% গণিত, ১৩.১% পরিবেশ পরিচিতি (সমাজ) ও ১৪.৩% পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান) বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। প্রায় ৪০% নারী শিক্ষক ও ৫৮.৫% পুরুষ শিক্ষকের কোনো বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ নেই।

বিষয় ও জেন্ডার অনুসারে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ রয়েছে এমন শিক্ষকদের হার

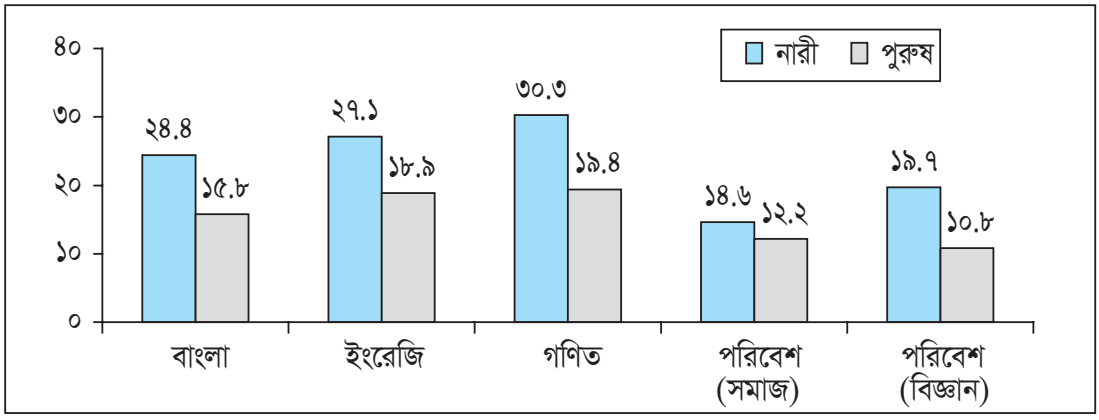

- গত এক দশকে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের অনুপস্থিতির ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় নি; ১৯৯৮ ও ২০০৮ উভয় সালেই শিক্ষকদের অনুপস্থিতির হার ছিলো প্রায় ১২-১৩%। উল্লিখিত সংখ্যার প্রায় অর্ধেক শিক্ষক ছুটিতে রয়েছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিলম্বে উপস্থিতি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে একটি মারাত্মক সমস্যা হিসেবে দেখা গেছে। জরিপের দিন ৪২.৫% শিক্ষক নিজ নিজ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেরিতে উপস্থিত হয়েছিলেন। গড়ে শিক্ষকরা নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা পর উপস্থিত হয়েছিলেন। প্রায় অর্ধেক নারী শিক্ষক ও ৩৮.৩% পুরুষ শিক্ষক দেরি করে এসেছিলেন। গ্রামীণ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে এ হার ৪৪.২% আর শহরের শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ৩১.৯%। সরকারি, বেসরকারি ও এবতেদায়ি মাদ্রাসার প্রায় অর্ধেক শিক্ষক, উচ্চ-মাদ্রাসার ৩৫.৮%, উচ্চ-বিদ্যালয়ের ২৩.৮% এবং উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ১২.৭% শিক্ষক জরিপের দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেরিতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে বিদ্যালয়ে দেরিতে উপস্থিত হয়েছেন এমন শিক্ষকদের হার

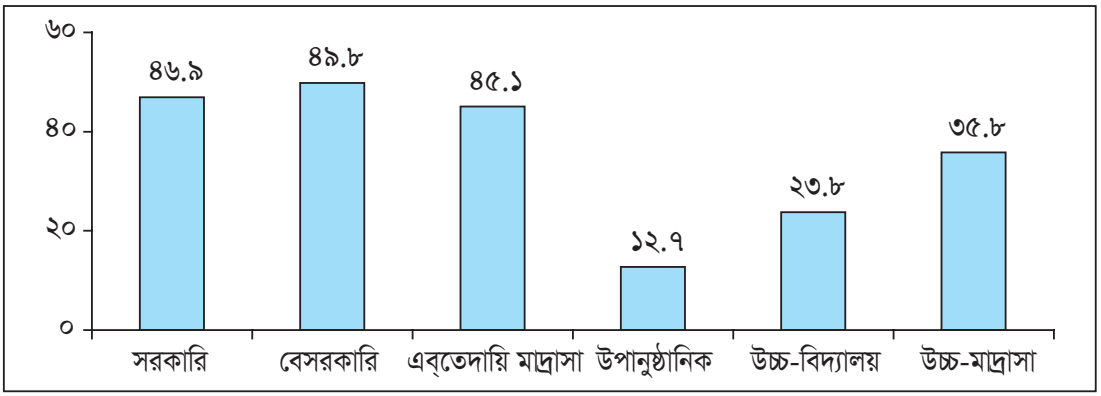

- একজন শিক্ষকের দিনে গড়ে ৫.২টি করে ক্লাস নিতে হয়। এ সংখ্যা সবচেয়ে বেশি বেসরকারি ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে (প্রত্যেকের ছয়টি করে) এবং সর্বনিম্ন উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (প্রত্যেকের ৩.৪টি করে ক্লাস)। পুরুষ শিক্ষকদের তুলনায় নারী শিক্ষকদের দিনে গড়ে একটি করে ক্লাস বেশি নিতে হয় এবং শহরের শিক্ষকদের তুলনায় গ্রামীণ শিক্ষকদের ১.২টি ক্লাস বেশি নিতে হয়।
- সময়ের সাথে সাথে শিক্ষার্থী-শিক্ষক অনুপাতেও উন্নতি ঘটেছে। ২০০৮ সালে এই অনুপাত পাওয়া গেছে ৩৯:১। সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে ১৯৯৮ সালের তুলনায় ২০০৮ সালে বেশ উন্নতি হয়েছে (৭৩:১ থেকে ৪৯:১ হয়েছে) এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে এই অনুপাত ১৯৯৮ সালে ৫৫:১ থেকে ২০০৮ সালে ৫০:১ হয়েছে। তবে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় এ বিষয়ে খুব সামান্যই পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিদ্যালয়ের ধরনের ওপর ভিত্তিকরে ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠনে পার্থক্য রয়েছে। এ অংশে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পর্কিত বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হলো:

- সব উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়, ৯৭% সরকারি বিদ্যালয়, ৯৩-৯৪% বেসরকারি বিদ্যালয় ও এবতেদায়ি মাদ্রাসা এবং ৮৩%-এর বেশি উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় ব্যবস্থাপনা কমিটি রয়েছে। কমিটির গড় সদস্য ৯.৮ জন– উচ্চ-মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসার কমিটিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক (১২.১ জন) আর উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের কমিটিতে সবচেয়ে কম সংখ্যক (৭.১) সদস্য রয়েছেন।

- গত দশ বছরে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির হার বেড়েছে– ১৯৯৮ সালের ১৯.২% থেকে বেড়ে ২০০৮ সালে তা ২৫.৯% হয়েছে। শুধু বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অন্য সব ধরনের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারী সদস্যের অন্তর্ভুক্তির হার বেড়েছে। কমিটিতে নারী সদস্যের হার সবচেয়ে বেশি উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে (৭৬.৩%) আর সবচেয়ে কম মাদ্রাসায় (৩%)। সরকারি বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক-পঞ্চমাংশ সদস্য নারী।

- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের গড়ে নয় বছরের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা রয়েছে– সবচেয়ে বেশি রয়েছে উচ্চ-বিদ্যালয়ের কমিটি সদস্যদের (১৩ বছর) এবং সবচেয়ে কম উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের কমিটি সদস্যদের (৫.২ বছর)। নারী সদস্যদের তুলনায় পুরুষ সদস্যরা বেশি লেখাপড়া করেছেন (গড়ে যথাক্রমে ৭.৩ বছর ও ৯.৬ বছর)। গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা বেশি পড়ালেখা করেছেন (যথাক্রমে ৮.৯ বছর ও ৯.৯ বছর)। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের মধ্যে প্রায় এক-চতুর্থাংশের পেশা কৃষি, ১৮.৯% ব্যবসা, ১৯.৯% শিক্ষক, ১৩.১% চাকুরি এবং ১৬.৫% ঘরের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের অধিকাংশ কৃষি, শিক্ষকতা বা ঘরের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন।

- ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের মধ্যে ২১.৬% সদস্য নারী। বিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে সবচেয়ে বেশি নারী রয়েছেন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৩৮.৪%) আর সবচেয়ে কম রয়েছেন মাদ্রাসায় (২%-এর কম)। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের মধ্যে ৩৫.২%-এর স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা রয়েছে, ৩৪.৭% স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেছেন, ২২.৯%-এর উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা এবং ৭.৩%-এর মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা রয়েছে।

- প্রায় অর্ধেক সংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। সরকারি বিদ্যালয়ের দুই-তৃতীয়াংশ, উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬১.৩%, বেসরকারি বিদ্যালয়ের ৪৫.২%, উচ্চ-মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসার এক-তৃতীয়াংশ আর এবতেদায়ি মাদ্রাসার ৭.৯% প্রধান শিক্ষক বা সুপারিনটেনডেন্ট বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা-সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

- ২০০৮ সালে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো গড়ে ৮.১টি করে সভা করেছে; প্রায় ৯৪% সভার লিখিত বিবরণ পাওয়া গেছে। সভাগুলোতে গড়ে ৭৯.২% সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সরকারি, বেসরকারি এবং উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো এই তিনটি সূচকেই অন্য বিদ্যালয়গুলো থেকে এগিয়ে রয়েছে। এ সূচকগুলোতে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থান এবতেদায়ি মাদ্রাসার।

- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় পরীক্ষা-সম্পর্কিত আলোচনা হয় সবচেয়ে বেশি। এরপর রয়েছে যথাক্রমে শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতি, শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম, বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ-সম্পর্কিত বিষয়, বৃক্ষরোপণ ও উপবৃত্তি-সম্পর্কিত আলোচনা। এই বিষয়গুলোতে সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহে সমগুরুত্ব দেওয়া হয়। উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উভয় ধরনের মাদ্রাসার সভায় বৃক্ষরোপণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয় নি। বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণ ও উপবৃত্তি-সম্পর্কিত বিষয়গুলো উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোর ব্যবস্থাপনা কমিটির কোনো বিষয় নয় বিধায় সেখানে এ বিষয়ে কোন আলোচনা হয় নি।

প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণ

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির বিষয়টি ঠিক তার পরের ধাপ। এই অংশে শিক্ষার্থীদের ভর্তি এবং উপস্থিতি-সম্পর্কিত বিষয়গুলো খানাজরিপ ও বিদ্যালয় জরিপের তথ্য থেকে উপস্থাপন করা হলো:

- প্রাথমিক স্তরে গ্রস ভর্তির অনুপাত গত দশকের প্রথম দুই বছরে বাড়লেও পরে তা কমে যায়। ২০০৮ সালে গ্রস ভর্তির অনুপাত ছিলো ১০৩%। নারী ও গ্রামের শিশুদের ক্ষেত্রে এই অনুপাত ক্রমান্বয়ে কমেছে বলে পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে। ২০০৮ সালে এই অনুপাত সবচেয়ে বেশি ছিলো গ্রামীণ এলাকার মেয়েদের মধ্যে (১০৭%) আর সবচেয়ে কম শহরের ছেলেদের (৯৭%) মধ্যে।

- প্রাথমিক শিক্ষার প্রথম শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী রয়েছে। এই সংখ্যা শ্রেণী বাড়ার সাথে সাথে কমতে থাকে। প্রাথমিক শিক্ষার শুরু ও শেষ পর্যায়ের শিক্ষার্থী সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য ১৯৯৮ সালে ছিলো ১৯.৭% পয়েন্ট যা ২০০৫ সালে কমে ৮.৫% পয়েন্ট হয়েছিলো; কিন্তু ২০০৮ সালে তা পুনরায় বেড়ে ১৪.১% পয়েন্ট হয়েছে।

- ১৯৯৮-২০০০ সালের দিকে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য নির্ধারিত বয়সসীমার (৬-১০ বছর) বাইরে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষার্থী প্রাথমিক স্তরে পড়ালেখা করতো; এই হার ২০০৫-০৮ সালের দিকে কমেছে। এ থেকে এই ধারণা হবে যে, প্রাথমিক স্তরের অধিকাংশ শিক্ষার্থী এখন নির্ধারিত বয়সসীমার মধ্যে রয়েছে। বিষয়টিকে গভীরভাবে দেখলে ভিন্ন চিত্র পাওয়া যায়। নিয়মানুসারে একজন শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণীর মধ্যকার পার্থক্য হওয়া উচিত পাঁচ; উদাহরণস্বরূপ, ছয় বছর বয়সী শিশু প্রথম শ্রেণীতে, সাত বছর বয়সী শিশু দ্বিতীয় শ্রেণীতে ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তব অবস্থা এরকম নয়। ২০০৮ সালে মাত্র এক-পঞ্চমাংশ শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে যাদের বয়স ও শ্রেণীর পার্থক্য ছিলো পাঁচ। বিগত বছরগুলোতে এই হার কখনোই ২৫ শতাংশের উপরে যায় নি। যদি বয়স ও শ্রেণীর পার্থক্য ছয় মেনে নেওয়া যায়, তবে সাম্প্রতিক সময়ে এই হারে কিছুটা উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যালয়ের ধরন ও সাল অনুসারে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বিন্যাস

বিদ্যালয়ের ধরন	সাল			
	১৯৯৮	২০০০	২০০৫	২০০৮
সরকারি	৬৮.৩	৬১.০	৫৯.২	৫৬.৯
বেসরকারি	১৫.২	২১.১	১৯.৪	২০.৫
উপানুষ্ঠানিক	৮.৮	৭.১	৬.১	৯.৬
মাদ্রাসা	৪.৬	৭.০	৯.৫	৭.০
কিন্ডারগার্টেন	১.৫	২.১	৪.৩	৪.৭
উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	১.৬	১.৬	১.৬	১.৩

- সব জরিপেই দেখা গেছে, প্রাথমিক স্তরের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে। কিন্তু সময়ের নিরিখে সরকারি বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তির হার দিন দিন কমছে। বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্রটি এক্ষেত্রে অপরিবর্তনীয়। মোট শিক্ষার্থীর এক-পঞ্চমাংশ বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে

পড়ছে। উচ্চ-মাধ্যমিক সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ছে ২%-এরও কম শিক্ষার্থী। অন্যদিকে, ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থী ভর্তির হার ক্রমে বাড়ছে। গ্রামীণ চট্টগ্রাম ও গ্রামীণ সিলেটে সর্বোচ্চ সংখ্যক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ুয়া শিক্ষার্থী রয়েছে (৬৬-৬৭%) আর সবচেয়ে কম রয়েছে বেসরকারি ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে। মাদ্রাসার ক্ষেত্রে সিলেটের অবস্থান সবচেয়ে উপরে আর তার পরেই রয়েছে চট্টগ্রাম।

- প্রাথমিক স্তরে নিট ভর্তির হার সময়ের সাথে বেড়েছে। এই হার ১৯৯৮ সালে ৭৭% থেকে ২০০৫ সালে ৮৬.৮%-এ উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ বছর প্রতি নিট ভর্তির হার বেড়েছে ১.৪% পয়েন্ট করে। এরপর থেকে এটি অপরিবর্তিত রয়েছে। ২০০৮ সালে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৮৬.৪%। ১৯৯৮ সালে সর্বপ্রথম মেয়েদের ভর্তির হার ছেলেদের চেয়ে বেশি চিহ্নিত করা হয় যা ২০০৮ সাল অব্দি বজায় থাকতে দেখা গেছে। পুরো দশক জুড়েই নিট ভর্তির হারের দিক থেকে গ্রামীণ এলাকার শিশুরা শহরের শিশুদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলো। তবে ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালে নিট ভর্তির নিরিখে জেন্ডার বা এলাকাভিত্তিক কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য পাওয়া যায় নি।

এলাকা, জেন্ডার ও সাল অনুসারে নিট ভর্তির হারের উন্নতি

এলাকা ও জেন্ডার	সাল				তাৎপর্যের মাত্রা
	১৯৯৮	২০০০	২০০৫	২০০৮	
বাংলাদেশ	৭৭.০	৭৯.৮	৮৬.৮	৮৬.৪	p <০.০০১
মেয়ে	৭৮.৫	৭৯.৯	৮৮.০	৮৭.১	p <০.০০১
ছেলে	৭৫.৫	৭৯.৮	৮৫.৬	৮৫.৬	p <০.০০১
তাৎপর্যের মাত্রা	p <০.০০১	ns	p <০.০০১	p <০.০১	
গ্রামীণ এলাকা	৭৬.৭	৭৯.৬	৮৬.৬	৮৬.২	p <০.০০১
শহর এলাকা	৭৯.০	৮১.৫	৮৮.১	৮৭.৬	p <০.০০১
তাৎপর্যের মাত্রা	p <০.০৫	p <০.০১	p <০.০৫	p <০.০৫	

ns = তাৎপর্যপূর্ণ নয় যদি p = ০.০৫

- বয়স-নির্দিষ্ট নিট ভর্তির হার থেকে দেখা যায়, ছয় থেকে নয় বছর অব্দি শিশুদের মাঝে এই হার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে তারপর ১০ বছর বয়সীদের মাঝে কমেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম ২০০৫ সাল; এই সালে নয় বছর থেকেই নিট ভর্তির হার

কমতে শুরু করেছে। ২০০৫ থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে নিট ভর্তির হার কমেছে ছয় বছর বয়সীদের মাঝে, প্রায় সমান ছিলো সাত ও আট বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে আর বেড়েছে নয় ও দশ বছর বয়সীদের মাঝে।

- আটটি স্ট্র্যাটার বিভিন্ন বছরে নিট ভর্তির হারের পর্যালোচনায় দেখা যায় গ্রামীণ রাজশাহী, গ্রামীণ খুলনা ও পৌরসভাগুলোতে এই হার ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সালে গ্রামীণ সিলেট বিভাগ ও পৌরসভাগুলোতে নিট ভর্তির হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে গেছে। গ্রামীণ সিলেট এলাকার ক্ষেত্রে ২০০০ ও ২০০৮ সালে গ্রস ও নিট উভয় হারের ক্ষেত্রেই অবনতি লক্ষ্য করা গেছে।

- চার ক্যাটাগরিভিত্তিক খানার খাদ্য নিরাপত্তা সূচকের নিরিখে দেখা যায়, প্রথম তিন ক্যাটাগরির নিট ভর্তির হার ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে কমেছে। তবে দরিদ্রতম ক্যাটাগরিতে নিট ভর্তির হার ২% বেড়েছে (৭৬.১% থেকে ৭৮.১%)।

- পুরো দশকজুড়েই পিতামাতার শিক্ষার সঙ্গে নিট ভর্তির হারের ইতিবাচক সহসম্পর্ক দেখা গেছে। দুজনের একজনও কখনোই বিদ্যালয়ে যান নি এমন পিতামাতার হার গত এক দশকে ক্রমান্বয়ে কমে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৯৮ সালে উক্ত ধরনের পিতামাতার হার ছিলো ৪৭.৭%, যা ২০০০-সালে ৪৫.৪%, ২০০৫-সালে ৩৫.৪% এবং ২০০৮-সালে ৩৩.৩%-এ নেমে এসেছে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ে গেছে এবং কখনোই বিদ্যালয়ে যায় নি উভয় ধরনের পিতামাতার সন্তানদের মধ্যে নিট ভর্তির হার বাড়লেও ২০০৮ সালে এসে তা থমকে দাঁড়িয়েছে।

- দরিদ্রতম পরিবার ও প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের অধিক হারে ভর্তি করার ক্ষেত্রে অন্য ধরনের বিদ্যালয়ের চেয়ে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলো এগিয়ে রয়েছে। অবশ্য এই ধরনের কিছু শিক্ষার্থী কিন্ডারগার্টেন বা উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হয়। সরকারি, বেসরকারি ও উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গড় বয়স প্রায় কাছাকাছি (গড়ে ৯ বছর)। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের গড় বয়স সবচেয়ে বেশি আর কিন্ডারগার্টেনে ও উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গড় বয়স সবচেয়ে কম। মাদ্রাসাগুলোতে কোন অমুসলিম শিক্ষার্থী পাওয়া যায় নি।

- একদিকে যেমন নির্ধারিত বয়সসীমার চেয়ে বেশি বয়সী শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে, অন্যদিকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সের কিছু শিশু প্রাক-প্রাথমিক, মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা গ্রেডবিহীন মাদ্রাসাগুলোতেও ভর্তি

হয়েছে। নির্ধারিত বয়সসীমার শিশুদের প্রাথমিক স্তরে ভর্তি হওয়ার হার ১৯৯৮ সালে ৭০.৯% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৫ সালে ৭৭%-এ উন্নীত হয় যা ২০০৮ সালে এসে ৭৫.৭%-এ হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী বয়সসীমার শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক ও গ্রেডবিহীন মাদ্রাসায় ভর্তির হার পুরো দশক জুড়েই বৃদ্ধি পেয়েছে।

- গত এক দশকে বিদ্যালয়-বহির্ভুত শিশুদের হার ক্রমে হ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৮ সালে ৬-১০ বছর বয়সীদের মধ্যে ২৩% বিদ্যালয়-বহির্ভুত শিশু ছিলো, যা কমে ২০০৮ সালে ১৩.৬%-এ দাঁড়িয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় পরিবর্তন (হ্রাস) দেখা গেছে দরিদ্রতম পরিবারগুলোতে। বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠানোর কারণ জানতে চাইলে প্রায় অর্ধেক সংখ্যক পিতামাতা বলেছেন যে, তাদের সন্তানের বয়স এখনো বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযুক্ত হয় নি; যদিও তখন তাদের বয়স ছিলো ৬-৮ বছর। আরেকটি কারণ হলো বিদ্যালয়কর্তৃক শিশুদের ভর্তি করতে অস্বীকৃতি জানানো। একটু বেশি বয়সের শিশুদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার কারণ হিসেবে পিতামাতারা 'অর্থাভাব' ও 'বিদ্যালয়ের প্রতি আকর্ষণহীনতা'কে দায়ী করেছেন। বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্ব অধিক হওয়ার কারণে ৪-৫% ও প্রতিবন্ধিতার কারণে ৪% শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে নি। যাদের বাড়ি থেকে দুই কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যালয় নেই, সে সমস্ত ক্ষেত্রে অর্ধেকের বেশি শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নি।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গ্রস ইনটেক হার সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এই হার ১৯৯৮ সালে ছিলো ২০৪%; যা ২০০০ সালে ১৯৬%, ২০০৫ সালে ১৬৬% এবং ২০০৮ সালে ১৫৯%-এ নেমে আসে। অন্যদিকে, নিট ইনটেক হার ১৯৯৮ সালে ৪১.৯% থেকে ২০০০ সালে ৪৪.৫%-এ উন্নীত হয়েছে। পরের দিকে অবশ্য এই হার ক্রমশ হ্রাস পেয়ে ২০০৫ সালে ৪১% এবং ২০০৮ সালে ৩৮.৬%-এ নেমে আসে।

- ছয় বছরের শিশুদের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়ার কথা থাকলেও তাদের একটি বড় অংশ বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় না। অন্যদিকে আবার যারা ভর্তি হয় তাদের একটি অংশ প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়সী শিশুদের প্রাক-প্রাথমিকে ভর্তির হার ১৯৯৮ সালে ৯.৫% থেকে ২০০০ সালে ১০.৮%, ২০০৫ সালে ১৬.৫% এবং ২০০৮ সালে ১৮.৮%-এ বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার এ বয়সের শিশুদের পিতামাতাদের বড় একটি অংশ ছয় বছরকে বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য অত্যন্ত কম বলে মনে করেন। এ ধরনের পিতামাতার হার ২০০০ সালে ছিলো ২০%, ২০০৫ সালে ২৫% আর ২০০৮ সালে ২৭%। উপর্যুক্ত তথ্য দুটি

স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দেয় যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের দ্বিতীয়টি অর্জনে বাংলাদেশ ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে।

- শিক্ষায় অংশগ্রহণ পরিমাপের জন্য শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক। যদিও ২০০৮ সালের খানা জরিপ থেকে বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ৯০% পাওয়া গেছে কিন্তু বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের গণনা থেকে দেখা গেছে এই হার মাত্র ৬৭.৭%। মেয়েদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার ছেলেদের চেয়ে (৬৯.৮% বনাম ৬৫.৪%) এবং গ্রামের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি হার শহরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় (৬৮% বনাম ৬৬.৬%) বেশি। সার্বিকভাবে ১৯৯৮-২০০০ সালে উপস্থিতির হার ৬০% থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালে ৬৭.৭% হয়েছে। প্রায় সব ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হার বৃদ্ধি পেয়েছে, তবে এ হার সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে।

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতির হারের উন্নতি

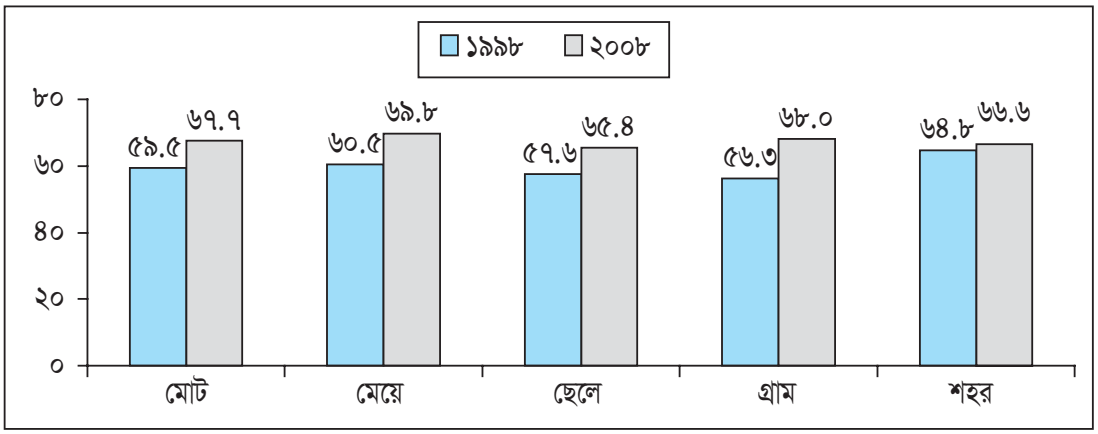

প্রাথমিক শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতা

উত্তীর্ণ, ঝরে পড়া ও পুনরাবৃত্তির হার নির্ধারণের পাশাপাশি শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার হার এবং পুরো শিক্ষাব্যবস্থার দক্ষতার সূচক নির্ণয় করার জন্য ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষদ্বয়ের তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অংশে বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে জাতীয় ও এলাকা পর্যায়ে, বিদ্যালয়ের ধরন ও জেন্ডার অনুসারে অভ্যন্তরীণ দক্ষতার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

- গত এক দশকে প্রাথমিক স্তরের বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের উত্তীর্ণ হওয়ার হার কমেছে। অপরদিকে ঝরে পড়া ও পুনরাবৃত্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। উভয়ের সম্মিলনে শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতার অপরাপর সূচকে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। যেখানে ১৯৯৮ সালে প্রতি শ্রেণীতে ঝরে পড়ার ও পুনরাবৃত্তির গড়

হারসমূহ ছিলো যথাক্রমে ৫.৬% ও ৮%, ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১১.৫% ও ১০.৯%-এ দাঁড়িয়েছে।

- প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের ৭৭.৪% তৃতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পৌঁছায়, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত টিকে থাকে ৫৮.৪% আর ৫০.১% প্রাথমিক শিক্ষার পুরো চক্র সম্পন্ন করতে পারে। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মধ্যে টিকে থাকার হার বেশি, আবার গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় শহরের শিক্ষার্থীদের মাঝে টিকে থাকার প্রবণতা বেশি। শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার হার সবচেয়ে বেশি পাওয়া গেছে উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (৮৩.৬%), এরপর উচ্চ-মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ি মাদ্রাসায় (৬৫.৫%)। এ হার সর্বনিম্ন পাওয়া গেছে এবতেদায়ি মাদ্রাসায় (৩১.৫%), বেসরকারি (৩৯.৭%) ও সরকারি (৫৩.১%) বিদ্যালয়ে।

বিদ্যালয়ের ধরণ ও এলাকা অনুসারে শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক শিক্ষা স্তর সমাপ্ত করার হার

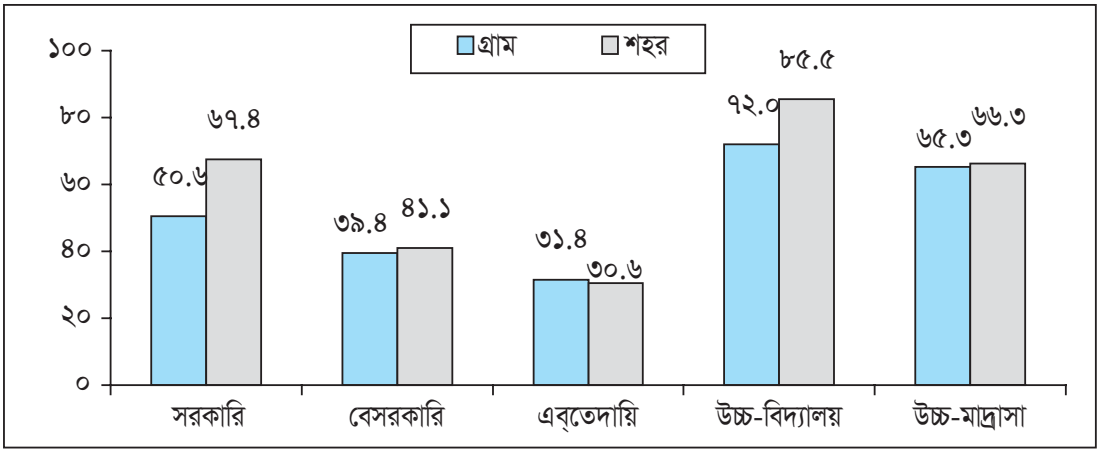

- গত এক দশকে বিদ্যালয়ে টিকে থাকা ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার হারে এবং অভ্যন্তরীণ দক্ষতার সূচকে বড় ধরনের পতন ঘটেছে। ১৯৯৮ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হার হ্রাস পেয়ে ৮০.৬% থেকে ৫৮.৪% হয়েছে আর শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার হার হ্রাস পেয়ে ৭৫.৭% থেকে ৫০.১% হয়েছে। ১৯৯৮ সালে প্রাথমিক শিক্ষার অভ্যন্তরীণ দক্ষতা সূচকের মান ছিলো ৭৬.৩% যা ২০০৮ সালে কমে হয়েছে ৫৭.২%। তথ্যসমূহ অভ্যন্তরীণ দক্ষতার নিরিখে সার্বিকভাবে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার বড় ধরনের অবনতির চিত্রই তুলে ধরে।

শিক্ষার্থীদের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন

শিক্ষার ফলাফল পরিমাপের প্রথম এবং একই সঙ্গে জোরালো ও জনপ্রিয় নির্দেশক হলো শিক্ষার্থীদের শিখনফল। গত এক দশকে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের শিখনফলের অগ্রগতি জানতে *এডুকেশন ওয়াচ ২০০০*-এর জন্য তৈরি করা অভীক্ষাটি ২০০৮ সালে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষার ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে ২৭টি যোগ্যতা এই অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার ঠিক আগ মুহূর্তে পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের এই অভীক্ষা নেওয়া হয়।

- অভীক্ষাভুক্ত ২৭টি প্রান্তিক যোগ্যতার মধ্যে ১৯৯৮ সালে শিক্ষার্থীরা গড়ে ১৬.১টি যোগ্যতা অর্জন করেছিলো যা ২০০৮ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮.৭টিতে। অর্থাৎ সার্বিকভাবে গত দশ বছরে শিক্ষার্থীদের গড় অর্জন বেড়েছে ২.৬টি প্রান্তিক যোগ্যতা। উভয় বছরেই মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এবং গ্রামের শিক্ষার্থীরা শহরের শিক্ষার্থীদের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে পিছিয়ে থাকলেও চারটি দলের শিক্ষার্থীদের শিখনফলেই উক্ত সময়ের ব্যবধানে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা গেছে। সরকারি, বেসরকারি ও উপানুষ্ঠানিক এই তিন ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়েই একই হারে অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের গড় প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে উন্নতি

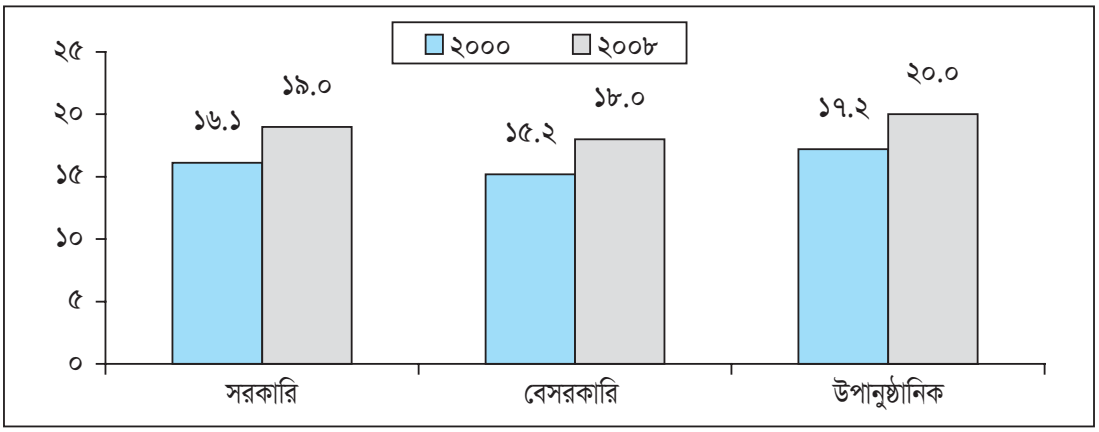

- ২০০৮ সালের অভীক্ষায় উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে। অভীক্ষার ফলাফলে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় দ্বিতীয়, সরকারি বিদ্যালয় তৃতীয় আর বেসরকারি বিদ্যালয় চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে। উভয় ধরনের মাদ্রাসাই সবচেয়ে কম সাফল্য অর্জন করেছে। সরকারি, বেসরকারি ও উচ্চ-বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফলাফলে জেন্ডার বৈষম্য দেখা গেছে যেখানে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা পিছিয়ে রয়েছে। বেসরকারি বিদ্যালয় ছাড়া অন্য ধরনের বিদ্যালয়ে শহরের শিক্ষার্থীরা গ্রামের শিক্ষার্থীদের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে রয়েছে।

বিদ্যালয়ের ধরন অনুসারে শিক্ষার্থীদের গড় প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জন ২০০৮

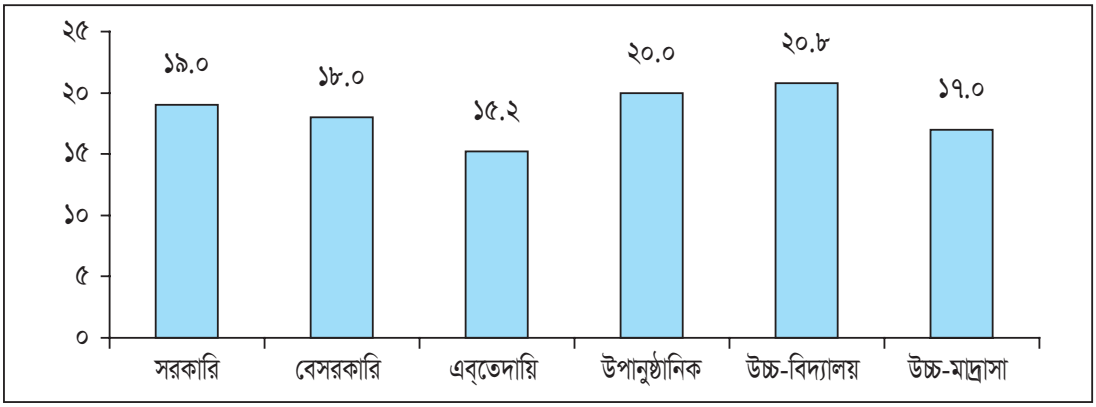

- উভয় বছরেই শিক্ষার্থীরা পরিবেশ পরিচিতি (বিজ্ঞান ও সমাজ উভয়) বিষয়ে ভালো করেছে। বাংলা ও গণিত ঠিক তার পরের অবস্থানে রয়েছে। ইংরেজিতে সবচেয়ে খারাপ ফলাফল পাওয়া গেছে। সব ধরনের বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনুধাবন-সম্পর্কিত প্রশ্নের তুলনায় জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলোতে ভালো করেছে। সার্বিকভাবে, অনুধাবন-সম্পর্কিত প্রশ্নের তুলনায় জ্ঞানমূলক প্রশ্নগুলোতেই তাদের অগ্রগতি বেশি। উভয় বছরেই শিক্ষার্থীরা তিনটি যোগ্যতায় সবচেয়ে কম পারদর্শিতা দেখিয়েছে। যোগ্যতাগুলো হলো– ইংরেজিতে লেখা, গণিতে বর্ণনামূলক সমস্যার সমাধান করা এবং হযরত মোহাম্মদ (সাঃ) বা নিজ নিজ ধর্মের ব্যক্তিত্বদের জীবনী বর্ণনা করতে পারা। ২০০০ সালের শিক্ষার্থীরা তিনটি যোগ্যতায় খুবই ভালো ও ১২টিতে মোটামুটি ভালো দক্ষতা দেখালেও ২০০৮ সালে তারা ১২টিতে খুবই ভালো ও সাতটিতে মোটামুটি ভালো দক্ষতা দেখিয়েছে।

- অন্যান্য গবেষণার মতই এই গবেষণা থেকেও দেখা গেছে যে, শিক্ষার্থীদের শিখন দক্ষতার সঙ্গে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত বিষয়াবলী ও লেখাপড়া বিষয়ক অতিরিক্ত কর্মকাণ্ডের ইতিবাচক (যোগবোধক) সহসম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষার্থীদের শিখনফলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে উক্ত তিন সেট চলকের মধ্যে আর্থসামাজিক অবস্থার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি, তারপরই রয়েছে লেখাপড়া বিষয়ক অতিরিক্ত কর্মকাণ্ডের ভূমিকা; আর সবচেয়ে কম ভূমিকা পাওয়া গেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসংক্রান্ত বিষয়াবলীর। এককভাবে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রয়েছে বাবার শিক্ষাগত যোগ্যতার, তারপরই গৃহশিক্ষকের।

জনসাধারণের শিক্ষা ও সাক্ষরতা পরিস্থিতি

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নানা ধারাবাহিক উদ্যোগের ফলে এবং বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বাড়ার কারণে দেশের সার্বিক শিক্ষা ও সাক্ষরতা পরিস্থিতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়ার কথা। এ অংশে চারটি খানা জরিপ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে জনসাধারণের শিক্ষা ও সাক্ষরতা পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হলো:

- জনসাধারণের শিক্ষার সার্বিক অবস্থা বোঝার জন্য এই গবেষণায় তিন ধরনের পরিমাপক ব্যবহার করা হয়েছে। এগুলো হলো– ছয় বা তার বেশি বয়সের মানুষদের বিদ্যালয়ে ভর্তির হার, ১১ বা তার বেশি বয়সের মানুষদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার এবং ১৫ বা তার বেশি বয়সের মানুষদের মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হার। গত এক দশকে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া এবং প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হারের দিক থেকে প্রায় একই ধরনের উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে– যথাক্রমে ১৩.৪% ও ১৩.৭% পয়েন্ট। তবে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপনের ক্ষেত্রে এই উন্নতি তুলনামূলকভাবে কম– মাত্র ২.৮% পয়েন্ট। ২০০৮ সালে দেশের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ পাওয়া গেছে যারা কমপক্ষে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষা সমাপ্ত করেছেন, অর্ধেকেরও বেশি মানুষ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন এবং ১৪.৩% মাধ্যমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন।

- উপর্যুক্ত তিনটি ক্ষেত্রেই গত এক দশকে নারীরা পুরুষদের তুলনায় পেছনে অবস্থান করেছে এবং শহরের মানুষ গ্রামের মানুষদের তুলনায় এগিয়ে ছিল; যদিও উন্নতির দিক দিয়ে পুরুষদের তুলনায় নারীরা এবং শহরের মানুষদের তুলনায় গ্রামের মানুষরা এগিয়ে আছে।

- সাত বা তার বেশি বয়সীদের মাঝে সাক্ষরতার হার ২০০০ সালে ছিলো ৩৭% যা ২০০৫ সালে বেড়ে ৪৯.৭% হয়েছিলো। এটি ২০০৮ সালে সামান্য কমে ৪৮.৫% হয়েছে। ১৫ বা তার বেশি বয়স্কদের সাক্ষরতার হার ২০০০ সালে ছিলো ৪১.৬% যা ২০০৫ সালে বেড়ে ৫২.৬% এবং ২০০৮ সালে কমে ৫২.১% হয়েছে। তবে ২০০৫ ও ২০০৮ সালের মধ্যকার এই পার্থক্য পারিসাংখ্যিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। জেন্ডার বা এলাকা নির্বিশেষে ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ সাল পর্যন্ত উন্নতি দেখা গেছে কিন্তু ২০০৫ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে শুধু পুরুষদের শিক্ষায় অবনতি লক্ষ্য করা গেছে। বয়সভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, শুধু ১৫-৩৪ বছর বয়সীদের সাক্ষরতার হারে একধরনের সুষম উন্নতি ঘটেছে।

- পুরো দশক জুড়েই গ্রামীণ ও শহর এলাকার মানুষদের সাক্ষরতার হারের মধ্যে ২০-২২% পয়েন্টের ব্যবধান লক্ষ্য করা গেছে। অপরদিকে জেন্ডারের

পরিপ্রেক্ষিতে এই দূরত্ব কমেছে। সাত বা তার বেশি বয়সীদের মাঝে নারী-পুরুষের সাক্ষরতার হারে ব্যবধান ছিলো ২০০০ সালে ৭.৩% পয়েন্ট, যা ২০০৮ সালে কমে ৩.৯% পয়েন্ট হয়েছে। বয়স্ক সাক্ষরতার ক্ষেত্রে এই ব্যবধান ২০০০ সালে ১১.৫% পয়েন্ট ছিলো, যা কমে ২০০৮ সালে ৭.১% পয়েন্ট হয়েছে।

সাল অনুসারে ১৫-৩৪ বছর বয়সীদের সাক্ষরতার হার

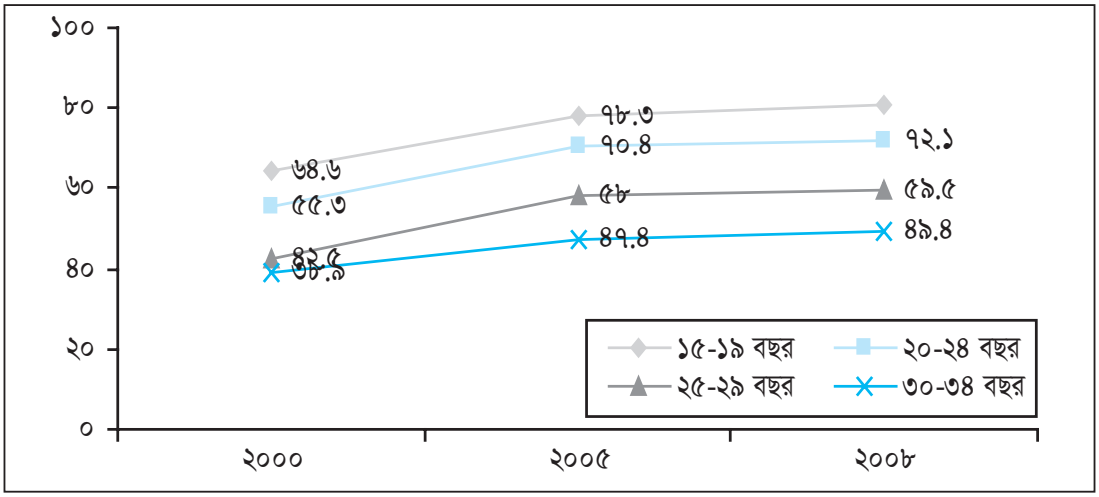

- একটি খানায় অন্তত একজন সাক্ষর লোক থাকলে সেই খানাটিকে সাক্ষর-খানা বলা যেতে পারে। ২০০০ সালের জরিপে ৬১% সাক্ষর-খানা পাওয়া গিয়েছিলো, যা ২০০৫ সালে বেড়ে ৭৮% ও ২০০৮ সালে ৭৮.৫% হয়েছে। গত আট বছরে অসাক্ষর-খানা কমেছে ১৭.৫% পয়েন্ট, অর্থাৎ প্রতি বছর দুই শতাংশ হারে কমেছে। ২০০৮ সালে শহর এলাকার ৮৯.৪% ও গ্রামীণ এলাকার ৭৬.৫% খানায় অন্তত একজন সাক্ষর মানুষ পাওয়া গেছে।

সাল অনুসারে কমপক্ষে একজন সাক্ষর লোক রয়েছে এমন খানার হার

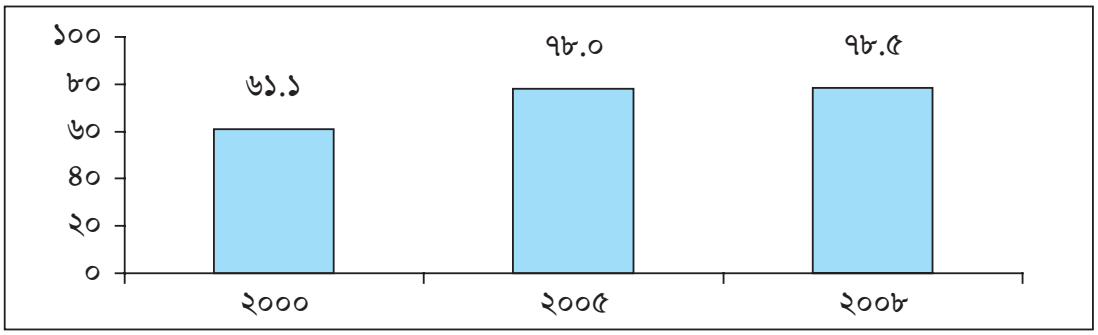

ঘ. উপসংহার ও প্রধান বার্তাসমূহ

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইনত বাধ্যতামূলক এবং সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়ন করার কথা। সকল শিশুর জন্য একই মানের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে সকল শিশুর প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করতে বাংলাদেশ নিজ দেশের জনগণ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জমতিয়েন সম্মেলনের পর থেকে এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সরকার দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্পের অধীনে নানা ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম প্রচলন, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষক নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও দরিদ্র ও বঞ্চিত শিশুদের জন্য শিক্ষা অর্জনের দ্বিতীয় সুযোগ হিসেবে দেশে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় চালু করা হয়েছে। যদিও দেশে দশ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে এবং এগুলোর ব্যবস্থাপনাও নানা ধরনের কিন্তু সরকার কেবল চার ধরনের বিদ্যালয়ের দেখাশুনা করে। সরকারি ব্যবস্থা আবার বেশ কেন্দ্রীভূত, উপজেলার সঙ্গে কেন্দ্রীয় পর্যায়ের সুসমন্বয়ের অভাবও রয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ধরন অনুসারে শিক্ষাক্রমেও ভিন্নতা রয়েছে। এসবই বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব কিছু চিত্র। জেন্ডার সমতাসহ উচ্চ ভর্তিহার অর্জনের দিক দিয়ে সফলতা পেলেও সাক্ষরতা পরিস্থিতি এবং সার্বিকভাবে শিক্ষার মান প্রত্যাশার তুলনায় অনেক নিচে। কয়েক বছর আগে ইউনেস্কো 'সবার জন্য শিক্ষাসংক্রান্ত বৈশ্বিক অবলোকন প্রতিবেদন'-এ সতর্ক করে দিয়েছিলো যে, গতানুগতিক ধারায় চললে বাংলাদেশের পক্ষে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কিংবা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে না। এই সতর্কতাকে কতটুকু গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করা হয়েছিলো তা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। উপর্যুক্ত আলোচনা, গবেষণা ফলাফল ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত মূল বার্তাসমূহ ও নীতিমালা সুপারিশ করা হলো।

গবেষণার মূল বার্তা

গবেষণার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত মূল বার্তাসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো:

প্রথম বার্তাটি হলো, আমাদের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের অপচয় ঘটছে। পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার আগেই ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের অর্ধেক ঝরে পড়ে। প্রাথমিক স্তরে ঝরে পড়া ও পুনরাবৃত্তির হার বৃদ্ধি হওয়ার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয়ে টিকে থাকার হারেও নিম্নগতি দেখা গেছে, যার ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করার হারেও অধোগতি বিরাজ করছে। ঝরে পড়ার এই উচ্চহার শিক্ষাক্ষেত্রে যথাযথ মানের অভাব, সম্পদের অপচয় ও পুরো ব্যবস্থার অযোগ্যতাকে নির্দেশ করে।

দ্বিতীয় বার্তাটি হলো, ২০০৫ সালের পর থেকে বিদ্যালয়ে ভর্তির হারে একপ্রকার স্থবিরতার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। প্রাথমিক শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ২০০৫ সাল পর্যন্ত বেশ অগ্রগতি দেখা গিয়েছিলো যা পরবর্তীতে স্থবির হয়ে পড়ে। কিছু অঞ্চলে এবং সার্বিকভাবে ছয় বছর বয়সী শিশুদের ভর্তির হার ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ার কারণে এই স্থবিরতা দেখা দিয়েছে। ভর্তি না হওয়া ছয় বছর বয়সী শিশুদের পিতামাতাদের অর্ধেকই মনে করেন, বিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য এরা এখনও যথেষ্ট বড় হয় নি। স্থবিরতার অন্য কারণগুলো হলো– ভর্তি করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অস্বীকৃতি, শিশুদের পড়াশোনার প্রতি অনাগ্রহ, পড়াশোনার খরচ বহনে পিতামাতার অসামর্থ্য এবং প্রতিবন্ধিতা। কোথাও কোথাও বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের অধিক দূরত্বও কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ছয় বছর বয়সীদের নিট ভর্তির নিম্নহার সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহের দ্বিতীয়টি অর্জনে বড় ধরনের বাধা।

তৃতীয় বার্তাটি হলো জাতীয় পর্যায়ে নির্ধারিত প্রান্তিক যোগ্যতাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উন্নতি দেখা গেলেও তা গ্রহণযোগ্য মাত্রার অনেক নিচে। বিদ্যালয়ের ধরন, এলাকা ও জেন্ডারের নিরিখে শিক্ষার্থীদের শিখনফলে অসমতা এবং বোধগম্যতা-সম্পর্কিত বিষয়ে কম সাফল্যের বিষয়টি শিক্ষার গুণগত মানের সঙ্গে সম্পৃক্ত। শিক্ষার্থীদের শিখন যোগ্যতা অর্জনে বিদ্যালয়সম্পৃক্ত প্রভাবকসমূহের তুলনায় তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও গৃহশিক্ষকের সহায়তা নেওয়া বেশি প্রভাব বিস্তার করায় এটাই বোঝা যাচ্ছে যে বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের প্রতি যথাযথ নজর দিচ্ছে না।

চতুর্থ বার্তাটি হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি, শ্রেণীকক্ষে উপস্থিতি, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়া ও প্রাথমিক শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় এগিয়ে থাকলেও শিখনফল অর্জনের দিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে পিছিয়ে আছে। এটি বিদ্যালয়ের ধরন নির্বিশেষে সত্য। শিক্ষকতা পেশায় নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে বটে কিন্তু প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে তাদের অংশগ্রহণ এখনও নগণ্য।

পঞ্চম বার্তাটি হলো মানসম্মত শিক্ষার নানা সূচকে মাদ্রাসাগুলো বেশ পিছিয়ে আছে। মাদ্রাসার নিম্নমানের শিক্ষাসুবিধা এজন্য আংশিকভাবে হলেও দায়ী। স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এবতেদায়ি মাদ্রাসা অন্য সব ধরনের প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বনিম্ন স্থানে অবস্থান করছে। এসব প্রতিষ্ঠানে আলাদা পাঠ্যবই ব্যবহার করা হয় এবং বেশিরভাগেরই ন্যূনতম অবকাঠামো এবং শিখনসুবিধাদি নেই। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব মাদ্রাসাগুলোর আরেকটি বড় সমস্যা। শিক্ষকতা, নেতৃত্ব প্রদান এবং মাদ্রাসার ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীদের অংশগ্রহণ সবচেয়ে কম।

ষষ্ঠ বার্তাটি হলো শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ক্রমাগত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে জনসাধারণের শিক্ষার স্তর ও সাক্ষরতার হার বেশ বেড়েছে। কমপক্ষে একবছরের জন্য হলেও বিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করেছে এমন মানুষের হার ও প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারীদের হার প্রতিবছর ১.৪% করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাক্ষরতা পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, তবুও তা ৫০% অতিক্রম করতে পরে নি।

সপ্তম বার্তাটি হলো, উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলো সবার জন্য শিক্ষা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মূলধারার শিক্ষার সম্পূরক ও পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে এই ব্যবস্থা ২০০৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট শিক্ষার্থীর ৯.৬%-কে ভর্তি করেছিলো। যদিও এই বিদ্যালয়গুলোর ভৌত সুবিধাদি মূলধারার বিদ্যালয়গুলোর মতো নয় কিন্তু এগুলো শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া, শিশুবান্ধব পরিবেশ, শিক্ষকদের উপস্থিতি, অভিভাবকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অন্যদের তুলনায় বেশ এগিয়ে আছে। উপর্যুক্ত ব্যবস্থাসমূহ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে তাদেরকে শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করতে ও শিখনফল অর্জনে সাফল্য এনে দেয়।

অষ্টম বার্তাটি হলো, বিগত দশকে সার্বিকভাবে বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থায় ভৌত সুবিধাদি, শিক্ষকদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং শিখনে সামগ্রিক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবে এ অগ্রগতি সর্বত্র সমানভাবে হয় নি। মাদ্রাসা ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ন্যূনতম আদর্শমান অর্জনে ঘাটতি রয়েছে। শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে কার্যকরভাবে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ধীরগতি বিরাজ করছে। এ সময়ে গৃহশিক্ষকের ওপর নির্ভরশীলতাও বেড়েছে।

নীতিসম্পর্কিত সুপারিশমালা

মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার ওপর *এডুকেশন ওয়াচ ২০০৮*-এর গবেষণার ফলাফল ও প্রধান বার্তাসমূহের নিরিখে নিম্নলিখিত নীতিসম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রদান করা হলো:

১. যারা যেভাবেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করুক না কেন, তাদেরকে অবশ্যই সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারী মূল কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর-এর সাথে সংযুক্ত থাকা উচিত। উপজেলার সব ধরনের প্রাথমিক শিক্ষার সমন্বয়করণে অধিদপ্তরের পক্ষে উপজেলা শিক্ষা অফিসের মূল ভূমিকা পালন করা উচিত। এর অর্থ হলো উপজেলা পর্যায়ে কর্তৃত্ব বিকেন্দ্রীকরণ করা; উপজেলার সব শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি ও সমতাসহ মানসম্মত শিক্ষা অর্জনে এলাকার জনসাধারণ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট উপজেলা কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।

২. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ন্যূনতম কী ধরনের অবকাঠামোগত ও শিখন সুবিধা, যোগ্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক, সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম ও সক্রিয় ব্যবস্থাপনা কমিটি থাকা উচিত তার একটা মান নির্ধারণ করা দরকার। মাদ্রাসাসহ সব ধরনের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একই সূচকের অধীনে মূল্যায়িত হওয়া প্রয়োজন। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এসব সুযোগ-সুবিধার অভাব পাওয়া যাবে সেগুলোকে সরাসরি সরকারের পক্ষ থেকে সহায়তাপ্রদান করা দরকার। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি নিশ্চিত করা ও ক্রমোন্নতি বোঝার জন্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে *এডুকেশন ওয়াচ*-এর মতো প্রতি বছর জরিপ পরিচালনা করা দরকার। মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিশ্চিত করার লক্ষে ধাপওয়ারী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কথাও ভাবা যেতে পারে। মূল কথা হলো, শিখনপ্রক্রিয়ার যাবতীয় কাজ গৃহশিক্ষকের বাড়ির বদলে বিদ্যালয়েই হওয়া উচিত।

৩. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ছয় বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা দরকার। ছয় বছর বয়সেই যেন অভিভাবকরা শিশুদের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করান এজন্য প্রয়োজনীয় প্রচারণা চালানো উচিত। এর অংশ হিসেবে বিদ্যালয়ের ক্যাচমেন্ট এলাকায় জরিপ চালানো, বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় নি এরকম শিশুর পিতামাতার সাথে কথা বলা এবং কমিউনিটি পর্যায়ে প্রচারণা চালানো দরকার। সব ধরনের গণমাধ্যম যেমন রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র, মোবাইল ফোন, বিলবোর্ড, ইন্টারনেট থেকে শুরু করে ফোক মিডিয়া পর্যন্ত সবার সহায়তায় জাতীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রচারণার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। এসবের কিছু কিছু ইতোমধ্যে নানা জায়গায় হচ্ছে কিন্তু এই প্রক্রিয়াটাকে শিগগিরই শক্তিশালী করা আর দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া দরকার। এ ধরনের প্রচারণায় নাগরিক সমাজকে যুক্ত করা যেতে পারে।

৪. বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের দূরত্বের কারণে বিদ্যালয়ে ভর্তির স্বল্পহারের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয় স্থাপনের কথা ভাবা যেতে পারে। যারা ছয় বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশ করতে পারে নি বা কোনো কারণে ঝরে পড়েছে শুধু তাদের জন্যই এই ব্যবস্থা করা যেতে পারে। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোতে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয় যেমন, ধারাবাহিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ, অ্যাকাডেমিক সুপারভিশন, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যক্রম, কমিউনিটি কর্তৃক তদারকি এবং সুবিধাবঞ্চিত ও প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ সহায়তা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়গুলোতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। নবনির্বাচিত সরকারের পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি টাস্ক ফোর্সের মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর সাথে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সমন্বয় ও সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন।

৫. জেন্ডার সমতাসহ প্রাথমিক শিক্ষায় শিশুদের অংশগ্রহণের হার বাড়ায় আনন্দিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে কিন্তু এতে আত্মতুষ্টির কোন অবকাশ নেই। শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা, দৈনন্দিন বিদ্যালয় পরিচালনা ইত্যাদিসহ নানা ক্ষেত্রে জেন্ডার ও উন্নয়ন বিষয়ে নজর দেওয়া দরকার। পড়ালেখা বিষয়ে বাড়তি যত্ন, মনোযোগ ও সহযোগিতা মেয়ে শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা অর্জনে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। একটি কার্যকর প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীদের মাদ্রাসাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসেবে নিয়োজিত করা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিতে অংশগ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য কিছু নীতি গ্রহণ করা দরকার।

৬. শিশু শিক্ষায় মাদ্রাসার অবদানের কথা বিবেচনায় নিয়ে এগুলোর মান বড়ানো দরকার। মাদ্রাসাগুলোতে প্রয়োজনীয় সুযোগসুবিধা প্রদানসহ একই ধরনের শিখন সুবিধা প্রক্রিয়া চালু, দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ও একীভূত শিক্ষাক্রম ও বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করা দরকার। মাদ্রাসার উন্নয়নে বাড়তি সহায়তার প্রয়োজন রয়েছে, সেইসঙ্গে এই সহায়তার সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সুপারভিশন ও মনিটরিং-এর ব্যবস্থাও করা দরকার।

৭. ১৯৯০ সালে প্রণীত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন সংস্কার করা দরকার কারণ এটি বর্তমান সময়ের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। বর্তমান আইন অনুসারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান চাইলে একজন শিক্ষার্থীকে তাঁর বিদ্যালয়ে ভর্তি নাও করতে পারেন। বিশেষ করে প্রতিবন্ধি শিক্ষার্থীরা এই আইনের শিকার হতে পারে। সবার জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন, উপজেলা শিক্ষা অফিসের বাড়তি কর্তৃত্ব, দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনের প্রতি লক্ষ্য রেখে আইনটির সংস্কার এখন সময়ের দাবি।

৮. গতানুগতিক ধারায় চলার নীতি পরিহার করে শিক্ষাব্যবস্থায় বড় ধরনের পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকারের। মানবসম্পদের যথাযথ উন্নতি ছাড়া 'ভিশন ২০২১' বা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বা অন্যান্য উন্নয়ন উদ্দেশ্যসমূহের কোনটিই বাস্তবায়ন সম্ভবপর হবে না।

৯. গতানুগতিক শিক্ষা বাজেট দিয়েও উপর্যুক্ত পরিবর্তন আনা যাবে না। বর্তমান অর্থবছরের (২০০৯-১০) বাজেটের 'থোক বরাদ্দে'র একটি বড় অংশ শিক্ষার উন্নয়নে প্রদান করা দরকার। শ্রেণীকক্ষের সংস্কৃতিতে যথাযথ পরিবর্তন আনয়নে ও বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলায় প্রভাববিস্তারে সক্ষম শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় করা দরকার। পাশাপাশি শিক্ষাসম্পর্কিত ন্যূনতম সুবিধাদি সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝে বৈষম্য কমানোর লক্ষ্যে বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলোকে সহায়তা করা এবং শক্তিশালী মনিটরিং প্রক্রিয়া গড়ে তোলার জন্য এ বরাদ্দ ব্যয় হতে পারে।

গবেষণায় যারা বিভিন্নভাবে সম্পৃক্ত

ফজলে হাসান আবেদ[১]
ড. কাজী খলিকুজ্জামান আহমদ[১]
ড. মনজুর আহমদ[১]
আফতাব উদ্দিন আহমদ[১]
ড. অধ্যাপক কাজী সালেহ্ আহমেদ[১,৫]
যেহীন আহমেদ[১]
অধ্যাপক কফিল উদ্দিন আহমেদ[৩]
জসিমউদ্দিন আহমেদ[৩]
শ্যামলী আকবর[৩]
সৈয়দা তাহ্মিনা আকতার[৩]
ড. মাহ্মুদুল আলম[২]
অধ্যাপক মোঃ শফিউল আলম[৩]
মোঃ আনোয়ার আলী[৩]
অধ্যাপক মুহম্মদ আলী[৩]
মোহাম্মদ ইলিয়াস আলী[৩]
রুহুল আমিন[৩]
মাহফুজ আনাম[১]
অধ্যাপক আলী আজম[৩]
ড. আনোয়ারা বেগম[৩]
ড. উম্মে সালেমা বেগম[৩]
ড. আব্বাস ভূইয়া[২]
ড. আহমদ মোশ্তাক রাজা চৌধুরী[১,৪]
ড. নাজমা চৌধুরী[১]
নবেন্দ্র দাহাল[১]
হাসিনা হাবিব[৩]
মুহাম্মদ আজিজুল হক[১]
কে. এম. এনামুল হক[২]
অধ্যাপক মুহাম্মদ নাজমুল হক[২]
ড. এম. আনোয়ারুল হক[১]
ড. এম. সামছুল হক[৩]
মোঃ মোফাজ্জল হোসেন[২]
ড. মুহাম্মদ ইব্রাহিম[১]
অধ্যাপক মো: রিয়াজুল ইসলাম[৩]
এ. কে. মির্জা শহিদুল ইসলাম[৩]
রওশন জাহান[১]
নুরুল ইসলাম খান[২]
হাসান এ. কেনান[১]
ড. আবু হামিদ লতিফ[১]
ড. ইমরান মতিন[২]
জামাল ইউ. মাহমুদ[১]
সিমিন মাহমুদ[২]
ড. আহমদুল্যাহ মিয়া[২]
মোহাম্মদ মহসিন[২]
সমীর রঞ্জন নাথ[২,৪]
জওশন আরা রহমান[১,৫]
কাজী ফজলুর রহমান[১]
ম. হাবিবুর রহমান[২]
আ. ন. স. হাবিবুর রহমান[৩]
মোঃ আবদুর রফিক[২]
ড. এম. মতিউর রহমান[৩]
মোঃ ফজলুর রহমান[৩]
ড. ছিদ্দিকুর রহমান[২]
এ. এন. রাশেদা[১]
তালেয়া রেহমান[১]
গৌতম রায়[৩]
ড. এম. আবদুস সাত্তার[৩]
ড. কাজী শাহাবউদ্দিন[১]
অধ্যাপক রেহমান সোবহান[১]
সাব্বির বিন সাম্স[২]
মহিউদ্দিন আহমেদ তালুকদার[২]
মোহাম্মদ মুনতাসিম তানভীর[২]
এ. এম. এম. আহসান উল্লাহ[৩]

১. উপদেষ্টা বোর্ড সদস্য
২. কর্মদল সদস্য
৩. টেকনিক্যাল টিম সদস্য
৪. প্রতিবেদন প্রণয়নকারী
৫. রিভিউ টিম সদস্য

Education Watch 2008

State of Primary Education in Bangladesh

Progress Made, Challenges Remained

Overview

Published by

Campaign for Popular Education (CAMPE)
Bangladesh

Education Watch 2008

State of Primary Education in Bangladesh

Progress Made, Challenges Remained

Overview of the Main Report

Samir Ranjan Nath
A Mushtaque R Chowdhury

November 2009

Campaign for Popular Education (CAMPE)

Contact address
Campaign for Popular Education (CAMPE), Bangladesh
5/14 Humayun Road, Mohammadpur, Dhaka 1207
Phone: 9130427, 8155031, 8155032
E-mail: info@campebd.org
Website: www.campebd.org

Overview

A. Introduction and Objectives

The *Education Watch* was launched in 1998 to contribute to attaining 'Education for All' through independent monitoring and evidence-based policy recommendations. For the first few years of its inception, the *Watch* was engaged in investigating primary and basic education and literacy status of the population. However, it moved its attention to secondary education in the subsequent years. As part of broader interest in quality of primary and basic education, internal efficiency, achievement of basic competencies, acquisition of terminal competencies and teacher education were examined in the first three reports. The *Watch* reports created much enthusiasm among various stakeholders of education. It may be mentioned that the *Education Watch* was the first to investigate competency-based learning achievement of students.

Bangladesh has done quite well in terms of improving the access and removing gender disparity at the primary level. The focus is now on how to improve the quality of education. The previous *Watch* reports and other findings pointed to a poor outcome in terms of quality. It is now several years since the first *Watch* report documented the quality issue. Over the years since this report was published, the government and NGOs carried out several quality improvement initiatives including the second Primary Education Development Programme (PEDP II). It was thus thought appropriate and timely to revisit the quality issue again. This would give an assessment of the quality improvement measures that have been taken during the past few years and provide an opportunity to revise the strategy, if necessary and plan for the future.

Duration of primary education in Bangladesh is five years. Children aged 6-10 years are the targeted population for compulsory primary education. There are 10 different types of primary educational institutions in the country which follow three different curricula. The government schools, non-government schools (registered and un-registered), community schools, experimental schools,

non-formal schools, and primary-attached to high schools follow the curriculum of the National Curriculum and Textbook Board (NCTB). The ebtedayee madrasas and the ebtedayee-attached to high madrasas follow the curriculum of the Bangladesh Madrasa Education Board (BMEB). The English medium Schools follow the British curriculum. The educational institutions also differ by management responsibilities. For instance, the Directorate of Primary Education (DPE) – the main government functionary to implement primary education in the country, looks after the first five types of institutions. The National Academy for Primary Education (NAPE) has some influences on the experimental schools, non-formal primary schools are under the management of various implementing NGOs and the Directorate of Secondary and Higher Secondary Education (DSHSE) looks after the primary-attached high schools. The madrasas follow the rules and regulations of the Madrasa Education Board and the English medium schools have no common authority.

The concept of quality is an encompassing one; anything that happens in the education system will have some bearing on its quality. On the other hand, there is no upper limit of the level of quality that one can expect from the education system. Not only in low income countries, the question of quality is often a matter of intense discourse in high income OECD countries as well. The question of quality of primary and basic education has been flagged as a matter of concern in every initiative taken internationally including those at the Jomtien conference and the Dakar Forum. Over a decade ago, the Delors Commission of UNESCO saw education as a process of lifelong learning based on four pillars such as *learning to know*, *learning to do*, *learning to live together* and *learning to be*. There are a number of frameworks for quality assessment. A most widely used one is the Input-Process-Output framework (nest page) and the *Watch* study decided to use this as a point of departure. As the figure shows each of the three components of the frame has many indicators. It may be mentioned that the Government of Bangladesh has assigned two sets of frameworks for monitoring the quality, viz.,

1 Organization for Economic Cooperation and Development

Primary School Quality Levels (PSQL) and Key Performance Indicators (KPI) and all of these could be placed in one or the other of the three components of the Input-Process-Output framework.

Analytical framework for quality assessment

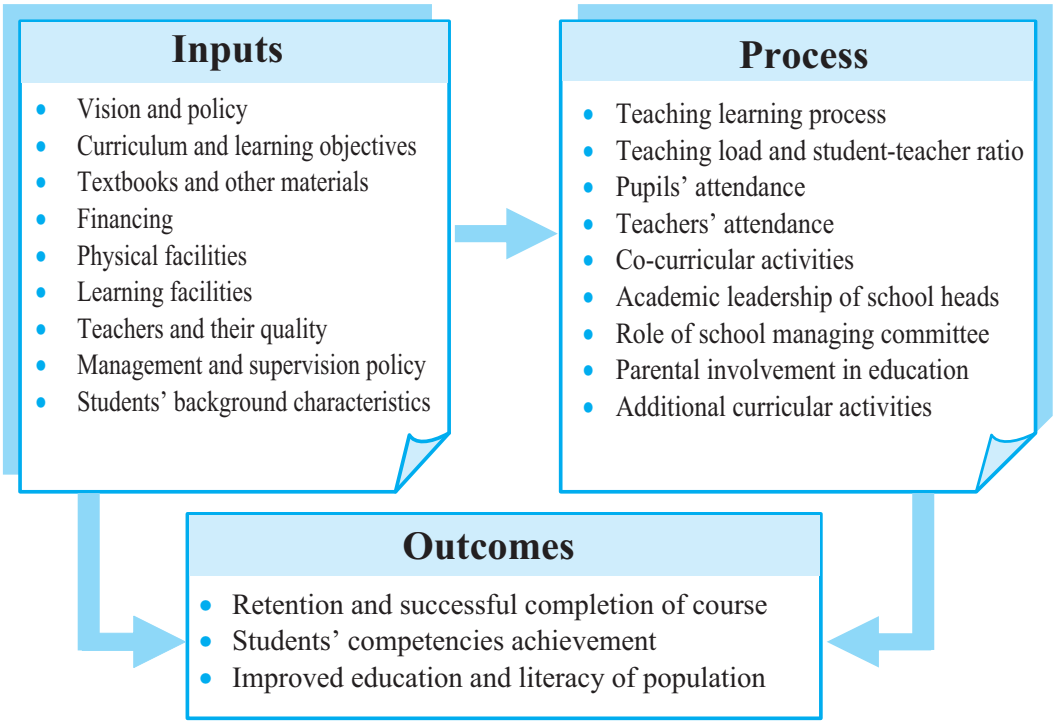

Keeping in mind the above analytical framework, the following four objectives formed the basis of the *Education Watch 2008*:

1. To measure progress in achievement of the national goals of primary and basic education in terms of various quality indicators including competencies and those mentioned in the two sets of progress monitoring indicators, viz., PSQL and KPI.
2. To explore the relationship of the learning achievements of the students with other quality indicators (both input and process) including students socioeconomic background.
3. To investigate the progress made in the status of children's participation in primary education, and correlates and constraints of participation.
4. To know the current education and literacy levels of the population and their progress over time.

B. Data and Methodology

This study collected new field-level data in 2008 as well as used previous *Education Watch* database (1998, 2000 and 2005). Surveys of educational institutions and households were required for the fulfillment of first two objectives and household survey for the third and fourth objectives. The competency-based test instrument which was developed for and used in *Education Watch 2000* was used for the partial fulfillment of the second objective. Twenty-seven of the 50 terminal competencies were addressed in this instrument. The students of class V were brought under test in November 2008 – just before completion of primary education.

For the survey of educational institutions, six of the 10 types of primary schools were considered: the government primary schools, non-government primary schools, ebtedayee madrasas, non-formal primary schools, primary-attached high schools, and ebtedayee-attached high madrasas. With rural and urban schools being considered independently the total strata considered for school survey was thus 12. The plan was to take 30 randomly picked educational institutions from each stratum and administer tests on 20 students of class V from each institution but due to *inadequate* number of ebtedayee madrasas in the urban areas it was not possible to administer the test on the intended number of students of this category. In some cases, due to small number of students in class V, the number of schools had to be increased. Finally, 440 educational institutions were surveyed, from which 7,093 students were tested for competency achievements. Data on the socioeconomic status were collected from 7,070 of these students.

The household survey was done to investigate participation and information on out-of-schooled children and their socioeconomic status. For this, similar to the previous *Education Watch* studies, the country was divided into eight strata– six rural and two urban. The strata are: rural Dhaka division, rural Chittagong division, rural Rajshahi division, rural Khulna division, rural Sylhet division, rural Barisal division, city corporations and the municipalities. The plan was

to survey 3,000 households from 120 villages/*mahallahs* in each stratum but the number of villages/*mahallahs* had to be increased due to shortage of adequate number of households in some selected villages/*mahallahs*. Finally, 24,007 households from 1,003 villagaes/*mahalahs* were surveyed. The total population in these households was 113,320. Of them, 14,688 were primary school aged children (6-10 years) and 15,189 currently enrolled in primary schools.

School lists prepared by the Directorate of Primary Education (DPE) and the Bangladesh Bureau of Educational Information and Statistics (BANBEIS) were used as sampling frame for the school survey. On the other hand, district-wise village/*mahallah* list produced by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) was used as sampling frame for the household survey. All field work was done from mid October to mid December 2008.

C. Major Findings

Educational facilities and learning provisions

The first step of any education system is to create appropriate facilities and provisions at the institution level. This section explores progress since the previous surveys in 1998.

- Overall, the physical facilities of the primary educational institutions improved during last 10 years. The improvement can be noticed in terms of number of classrooms, quality of construction materials, water and sanitation facilities and seating capacity in the schools.
- Although the government primary schools were ahead of the others in terms of increasing the number of classrooms, it was the non-government schools which improved more than others in terms of quality of construction materials. On an average, the government schools had 3.8 classrooms in 1998, which increased to 4.6 in 2008. Overall, a third of the school structures were fully brick-built in 1998 which increased to 60% in 2008.

The government and the non-government schools had respectively 44.5% and 47.9% fully brick-build structures in 1998. These figures increased respectively to 67.6% and 90% in 2008. Most of the classrooms were in good condition, others at various levels of dilapidation.

- Fortyseven percent of the primary schools had pipe water or tube wells as the source of drinking water in 1998 which increased to 53.8% in 2008. Such improvement was highest in the government schools (18.7 percentage points), followed by the non-government schools (13 percentage points). Overall, a third of the schools used drinking water facility of the neighbouring households or educational institutions and others stored water in jar or had no facility.
- In 1998, less than a quarter of the government and non-government primary schools had separate toilet facilities for boys and girls which increased to respectively 50.7% and 42.9% in 2008. Overall, 70% of the schools had toilet facility for the students, half of which had separate arrangement for boys and girls. A fifth of the school toilets were *hygienic* and 35.7% *moderately hygienic*.
- In 2008, only 16% of the school structures had provision for the physically challenged students' entry with the government schools much ahead of the others with 34.2% structures friendly for them. Toilet facility for such students was extremely negligible in all types of primary schools.
- Overall, two-thirds of the registered students were able to seat with ease in the classrooms in 1998 which increased to about 90% in 2008. Two reasons could be identified for this; class size reduced from 48.2 in 1998 to 41.2 in 2008 and seating facility increased from 32 students per class in 1998 to 37 in 2008. Improvement of seating capacity was found in each type of primary schools except for the ebtedayee madrasas.

Percentage of students who could seat with ease by school type and year

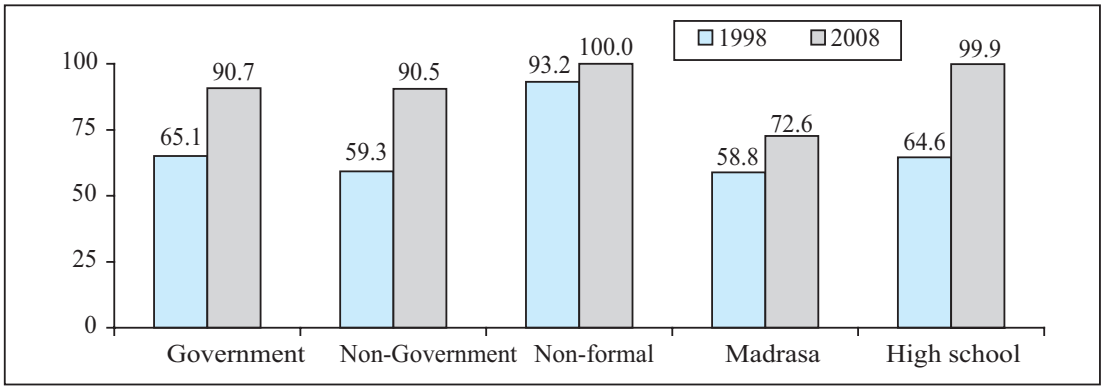

- Although about 80% of the primary schools had playgrounds in 2008, only 8.5% had flower garden within the school premises. Primary-attached high schools and high madrasas were top two types of institutions having these facilities. The non-formal schools had scarcity of both.
- Nearly 40% of the schools had electricity connection with substantial variation by school type but only a quarter of the classrooms had electric lights and fans. The primary-attached high schools were much better-off in this respect. The madrasas and the non-formal schools were way behind. However, irrespective of school type, almost all the classrooms had a good flow of natural light and air on a normal day.
- Floors and corridors of over three-fifths of the primary schools were found to be clean on the survey day of 2008. Dusts were found in the floors and corridors of nearly a fifth of the schools and rests had dust and waste papers on the floors. Walls of over three-quarters of the classrooms were clean. In terms of cleanliness, the non-formal schools and the primary-attached to high schools were ahead of the others.
- Blackboards of nearly 80% of the classrooms were in very good condition, meaning that legible writing was possible. Ninety percent of the blackboards of the non-formal schools and about 80% of those in the high schools and madrasas and government and non-government primary schools were in very good condition. This was only 44% for the ebtedayee madrasas.

- Over 16% of the schools organized general coaching (supplementary tutoring) for quality improvement of the students in different classes, 52% organized coaching only for the primary scholarship examinees. The non-formal schools were more likely to arrange general coaching and the others arranged coaching for the scholarship examinees. Nearly 90% of the government and non-government schools arranged coaching for the scholarship examinees. Overall, 18.4% of the schools, majority of which are high schools, charged money for such extra tutoring.

- Paid private tutoring increased during the past decade irrespective of class, sex area and school type. In 1998 and 2000, over a fifth of the primary school students had private supplementary tutors which increased to 31% in 2005 and 38% in 2008. The girls and the rural students lagged behind their counterparts in getting such support. Students of the English medium and the primary-attached high schools were far ahead of the others with over two-thirds availing this and the non-formal school students had the lowest incidence (12%). Nearly 53% of the students of class V had private tutor in 2008.

Rural-urban gap in private supplementary tutoring by year

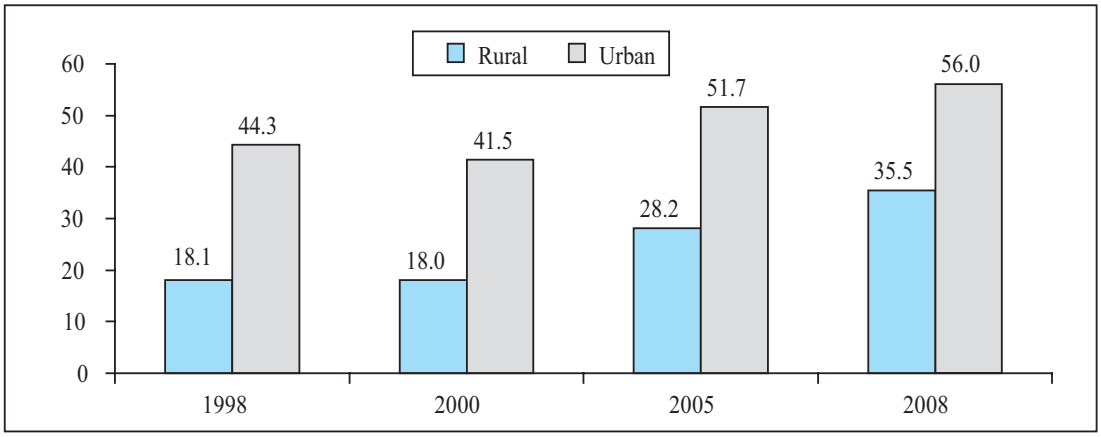

- Fine arts, singing and dancing are integral parts of non-formal school education. A half of the other schools had arrangement for art classes. Annual sports were arranged in 53.4% of the schools in 2008. Less than a half of the schools had Cub activities. Very few madrasas arranged annual sports, Cub

activities or art classes. Non-formal schools did not have any Cub activities or annual sports.

- Average number of teachers per government primary school increased from 4.4 in 1998 to 5.2 in 2008. No change was observed in the non-government or the non-formal schools. Overall, less than a third of all primary school teachers were female in 1998 which increased to 39.3% in 2008. Non-formal schools traditionally recruit female teachers; thus, the highest proportion of female teachers was found in this category of schools in both the surveys. Lowest proportion of female teachers was found in the madrasas (10.5%). Impressive improvement in the recruitment of female teachers was observed in the government schools and the primary-attached high schools. Female teachers were concentrated more in the urban schools than in the rural schools (57.4% vs. 36.6%).
- Educational qualification of the teachers also improved during the past decade. Nearly a quarter of the non-formal school teachers and few others in other types of schools had incomplete secondary education in 1998, no such teacher was found in 2008. Teachers with masters degree increased from 14.4% in 1998 to 18.9% in 2008. The female teachers were less educated compared to their male counterparts.
- More than 85% of the teachers of the government, non-government and non-formal schools had professional training, which was below 11% for the madrasas and 56% for the high schools. Impressive improvement in trained teachers was observed in the non-government primary schools (25.9% in 1998 to 86.8% in 2008).
- Less than a half of the teachers received one or more subject-based training. Subject-wise, 19.2% of the teachers received training in Bangla, 22.1% in English, 23.4% in mathematics, 13.1% in *Poribesh Porichiti* (society) and 14.3% in *Poribesh Porichiti* (science). Nearly 40% of the female teachers and 58.5% of the male teachers had no subject-based training.

Percentage of teachers having training in various subjects by gender, 2008

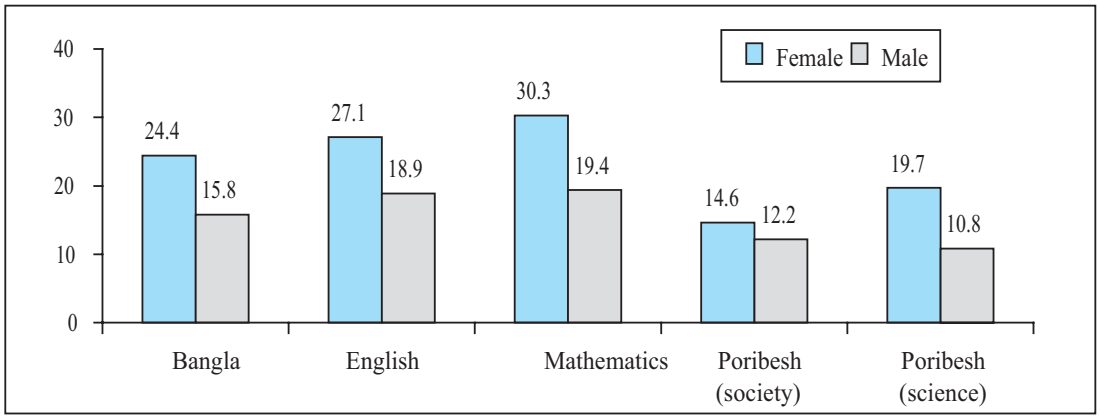

- No change was observed in teachers' absenteeism; it was about 12-13% in both 1998 and 2008. About half of them were on leave. Teachers' late att*endance in schools* was observed as a serious problem. On an average, 42.5% of the primary teachers came to school late on the survey day. Mean amount of late time was half an hour. About half of the females and 38.3% of the male teachers were late. This was 44.2% among the rural school teachers and 31.9% in urban areas. Nearly half of the teachers of the government and non-government schools and ebtedayee madrasas, 35.8% of those in high madrasas, 23.8% in the high schools and 12.7% of the non-formal school teachers were late on the survey day.

Percentage of teachers came to school late by school type, 2008

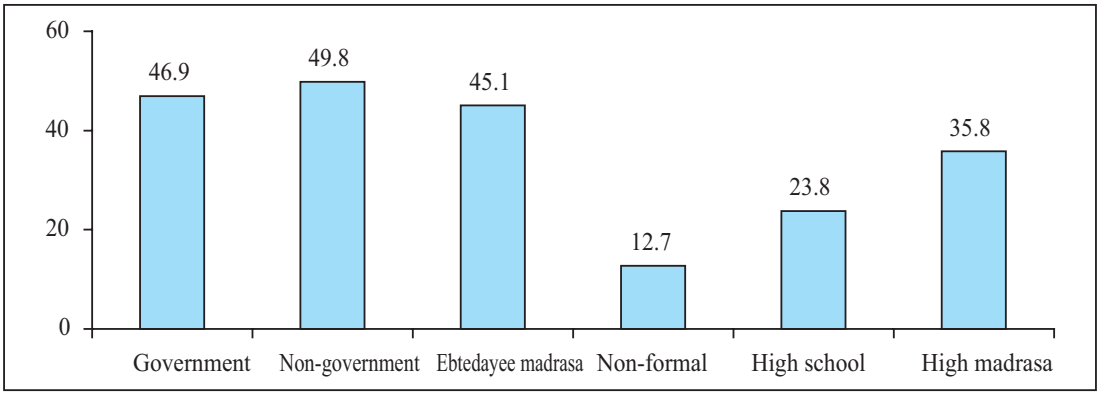

- On an average, the teachers had to conduct 5.2 classes per day; this was highest in the non-government and non-formal schools

(six classes each) and lowest in the high schools (3.4 classes each). The female teachers had to take a class more per day than the male teachers and the rural teachers had to take 1.2 more class than their urban counterparts.

- Student-teacher ratio at primary level improved over time. Overall, the ratio was found 39:1 in 2008. It reduced from 73:1 in 1998 to 49:1 in 2008 in the government schools and from 55:1 in 1998 to 50:1 in 2008 in the non-government schools. Very small change was noticed in the non-formal schools and the madrasas.

Management of primary institutions

School management is a very important issue. Composition of management committees differs by school type. This section explores various issues related to school managing committees.

- All non-formal schools, 97% of the government schools, 93-94% of the non-government schools and ebtedayee madrasas and over about 83% of the high schools and madrasas had school managing committees. Average size of the committee was 9.8– highest in the high madrasas (12.1) and lowest in the non-formal schools (7.1).
- Participation of female members in the committees increased over time – from 19.2% in 1998 to 25.9% in 2008. The increase of females' share in the SMCs was noticed in all types of schools except the non-government primary schools. Females' participation was highest in the non-formal schools (76.3%) and lowest in the madrasas (3%). A fifth of the SMC members of the government schools were females.
- The SMC members, on an average, had nine years of schooling – highest in the high schools (13 years) and lowest in the non-formal schools (5.2 years). The male members were more educated than the female members (9.6 years vs. 7.3 years) and

the SMC members of the urban schools had more schooling than those in rural schools (9.9 years vs. 8.9 years). Overall, a quarter of the SMC members were living on agriculture, 18.9% on business, 19.9% on teaching, 13.1% on service and 16.5% on housekeeping. Agriculture, teaching and housekeeping were the major occupations of the SMC members of non-formal schools.

- The heads of the institutions play very important role in managing the schools as ex-officio member secretary of the committees. Of them, 21.6% were females. The highest proportion of female heads was found in the government primary schools (38.4%) and lowest in the madrasas (less than 2%).
- Highest level of education of 35.2% of the institution heads was a masters degree, 34.7% a bachelor degree, 22.9% completed higher secondary education and 7.3% completed secondary education.
- About half of the heads of institutions received training on school management. Two-thirds of the government, 61.3% of the high school, 45.2% of the non-government, a third of the high madrasa and 7.9% of the ebtedayee madrasa heads/superintendents received management training.
- In 2008, the SMCs had 8.1 meetings, of which 94% had recorded meeting minutes. On an average, 79.2% of the members attended in the meetings. Government, non-government and non-formal primary schools were ahead of the others in all three indicators. The situation of the ebtedayee madrasas was the poorest.
- 'Examination affairs' was the most discussed issue of the meetings, followed by student absenteeism, teaching-learning provision, construction issues, tree plantation and *upabritti*. The government and the non-government schools gave mostly a similar level of emphasis on the issues. High schools and both types of madrasas placed no emphasis on tree plantation. Non-formal schools had nothing to do with *upabritti* or construction activities.

Participation in primary education

Access to education is the most important issue after setting up a school. Attendance of students in the classrooms is a next step. This section analyses both enrolment and attendance of the students using household and school survey data.

- The gross enrolment ratio increased during the first two years of the decade and then declined and stood at 103% in 2008. Smooth decline among the girls and the rural children was observed. In 2008, the ratio was highest among the rural girls (107%) and lowest among the urban boys (97%).
- The highest proportion of primary school students was found in class I which gradually decreased with increasing grade. The difference between the proportions of students of two ends of primary education was 19.7 percentage points in 1998 which decreased by 8.5 percentage points in 2005, but increased again by 14.1 percentage points in 2008.
- During 1998-2000, about a third of the primary school students were out of officially determined age range (6-10 years) which decreased during 2005-8. This gives the impression that majority of the primary students were within the official age range. A critical look at the age issue gave a different scenario. Ideally the difference between age and grade should be five; for instance, the children of age six should enrol in class I, age seven in class II and so on. However, this was not the case. In 2008, only a fifth of the primary students enrolled in the classes suitable for their ages but this never went beyond 25%. A slight improvement could be noticed over time, if a difference of six is considered acceptable between age and class.
- The highest proportion of the primary students was found enrolled in the government primary schools in all the surveys. But the share of the government schools gradually decreased over time. A static situation was observed for non-government primary schools with about 20% share and for the primary

attached to secondary schools with less than 2% share. Share of the English medium kindergartens also increased over time. Rural Chittagong and Sylhet had the highest proportion of government school students (66-67%) and lowest proportion of non-government and non-formal school students. Sylhet was the top in terms of madrasa students followed by Chittagong.

Percentage distribution of primary school students by school type and year

School type	Year			
	1998	2000	2005	2008
Government	68.3	61.0	59.2	56.9
Non-government	15.2	21.1	19.4	20.5
Non-formal	8.8	7.1	6.1	9.6
Madrassa	4.6	7.0	9.5	7.0
Kindergarten	1.5	2.1	4.3	4.7
Primary attached to high school	1.6	1.6	1.6	1.3

- The net enrolment rate at primary level increased from 77% in 1998 to 86.8% in 2005, an increase at the rate of 1.4 percentage points per year. The rate got stagnant afterwards. The net rate was found to be 86.4% in 2008. The girls outnumbering the boys in net enrolment was first documented in 1998 (78.5% vs. 75.5%; $p<0.001$) and continued till 2008 (87.1% vs. 85.6%; $p<0.01$). The rural children lagged behind their urban counterparts in net enrolment throughout the decade. None of the differences (by gender or by area) between 2005 and 2008, however, were found statistically significant.

- Age specific net enrolment rate gradually increased from age six to nine and then declined at age 10 in three of the four surveys except 2005. Decline in the rate started from age nine in 2005. Between 2005 and 2008, the net rate declined much for those of age six; it was mostly equal for ages seven and eight but increased for ages nine and ten.

Progress in net enrolment rate by area, gender and year

Area and gender	Year				Level of significance
	1998	2000	2005	2008	
All Bangladesh	77.0	79.8	86.8	86.4	p <0.001
All Girls	78.5	79.9	88.0	87.1	p <0.001
All Boys	75.5	79.8	85.6	85.6	p <0.001
Level of significance	*p <0.001*	*ns*	*p <0.001*	*p <0.01*	
Rural areas	76.7	79.6	86.6	86.2	p <0.001
Urban areas	79.0	81.5	88.1	87.6	p <0.001
Level of significance	*p <0.05*	*p <0.01*	*p <0.05*	*p <0.05*	

ns = not significant at p = 0.05

- Of the eight strata, steady improvement in net enrolment was observed in three, viz., rural Rajshahi and Khulna divisions and the metropolitan cities. Significant fall between 2005 and 2008 was found in rural Sylhet division and the municipalities. Both gross and net enrolment ratios in Sylhet were significantly lower in 2000 and 2008 than the past years.
- In terms of correlates with economic status, the net rate between 2005 and 2008 declined in upper three of the four categories of self rated household food security status, but not in the poorest group where the rate increased two percentage points (from 76.1% to 78.1%).
- Positive correlation between net enrolment and parental education was also observed throughout the decade. The proportion of never schooled parents decreased over time – from 47.7% in 1998 to 45.4% in 2000, 35.4% in 2005 and 33.3% in 2008. The net enrolment rate increased for the children of both never and ever schooled parents during 1998-2005 which became stagnant in 2008 for both the groups.
- In terms of admitting children from the poorest households and the first generation learners, the non-formal schools did better

than others. Few children with such characteristics admitted in the kindergartens or the primary attached high schools. Mean age of the students of government, non-government and non-formal schools were mostly equal (average 9 years) but it was higher for the madrasas and lower for kindergartens and primary-attached high schools. No non-Muslim students were admitted in the madrasas.

- Not only the older students enrolled in the primary classes, some primary aged children also got enrolled in the pre-primary and secondary classes and the non-graded madrasas. The proportion of primary aged children in primary classes increased from 70.9% in 1998 to 77% in 2005 and then decreased to 75.7% in 2008. On the other hand, proportion of primary students enrolled in pre-primary and non-graded madrasas increased throughout the decade.

- Proportion of out-of-school children declined during the decade - 23% in 1998 to 13.6% in 2008. Major decline was observed in the *poorest* households. The parents were asked to mention the most important reason for their children's non-enrolment in school. In about a half of the out-of-school cases the parents thought that their children were not enough grown up to enrol in school although they were 6-8 years old. The other reason for younger children being out-of-school was the refusal by the schools. Reasons like 'scarcity of money' and 'losing interest in school' were mostly prominent for the older children. Five to six percent of the children could not enrol due to distance between home and school and about 4% could not do so due to disability. More than half of the children were out-of-school if there was no school within two kilometers radius of home.

- The gross intake ratio drastically decreased over time – from a very high of 204% in 1998 to 196% in 2000, 166% in 2005 and 159% in 2008. On the other hand, the net intake rate improved from 41.9% in 1998 to 44.5% in 2000 and then decreased to 41% in 2005 and 38.6% in 2008.

- The six years old children are supposed to enrol in class I but a large proportion did not. These children's enrolment in pre-primary class significantly increased over time – from 9.5% in 1998 to 10.8% in 2000, 16.5% in 2005 and 18.8% in 2008. Again for a good portion of them, the parents thought that age six was too young to enrol in school. They were about a fifth of all six years old children in 2000, 25% in 2005 and 27% in 2008. These two clearly shows that Bangladesh is going behind in terms of achieving the second MDG.
- Attendance in school is an important indicator for measuring participation in education. Although the respondents of household survey reported 90% attendance rate in 2008 the head count in the schools showed that it was only 67.7%. The school attendance rate was higher for the girls than the boys (69.8% vs. 65.4%) and the rural students than urban (68% vs. 66.6%). Overall, the attendance rate increased from about 60% during 1998-2000 to 67.7% in 2008. Increase in enrolment occurred in all types of primary schools; however, the highest rate was found for non-formal schools.

Progress in students' attendance rate

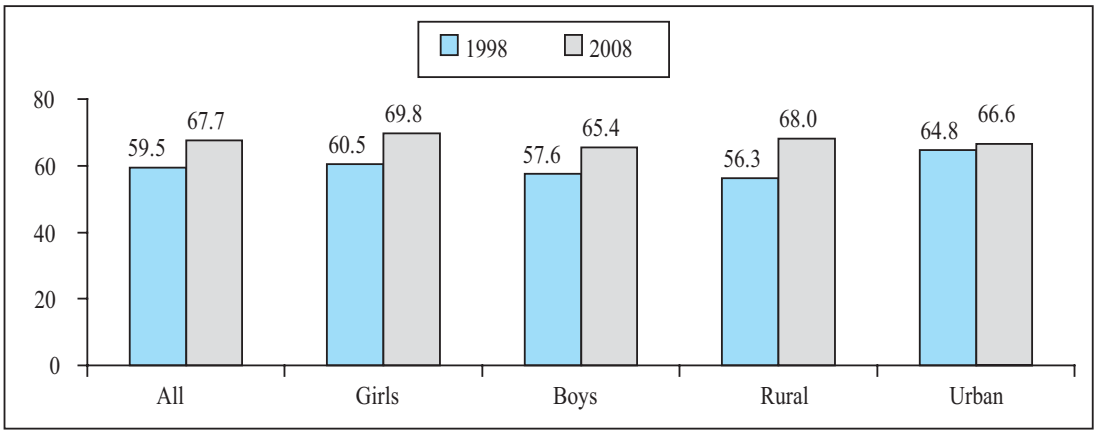

Internal efficiency of primary education

A reconstructed cohort analysis was done to estimate promotion, dropout and repetition rates and hence calculating retention and cycle completion rates and coefficient of efficiency of the system.

Extracting from school level data, this section provides national as well as area, school type and gender-wise analysis of internal efficiency.

- During the past decade, the promotion rates at different classes of primary educational institutions decreased. This means an increase in the dropout and repetition rates which have negative implications for other efficiency indicators. Whereas the average dropout and repetition rates in each class were respectively 5.6% and 8% in 1998, these increased to 11.5% and 10.9% in 2008 respectively.
- Of the children enrolled in class I, 77.4% reached at class III, 58.4% survived up to class V and 50.1% completed the full cycle of primary education. The survival and completion rates were higher for the girls than the boys. These were much higher for the urban students than their rural counterparts. The cycle completion rate was highest in the primary-attached high schools (83.7%), followed by ebtedayee-attached high madrasas (65.5%). It was lowest in the ebtedayee madrasas (31.5%), followed by non-government (39.7%) and government schools (53.1%).

Completion rate by school type, 2008

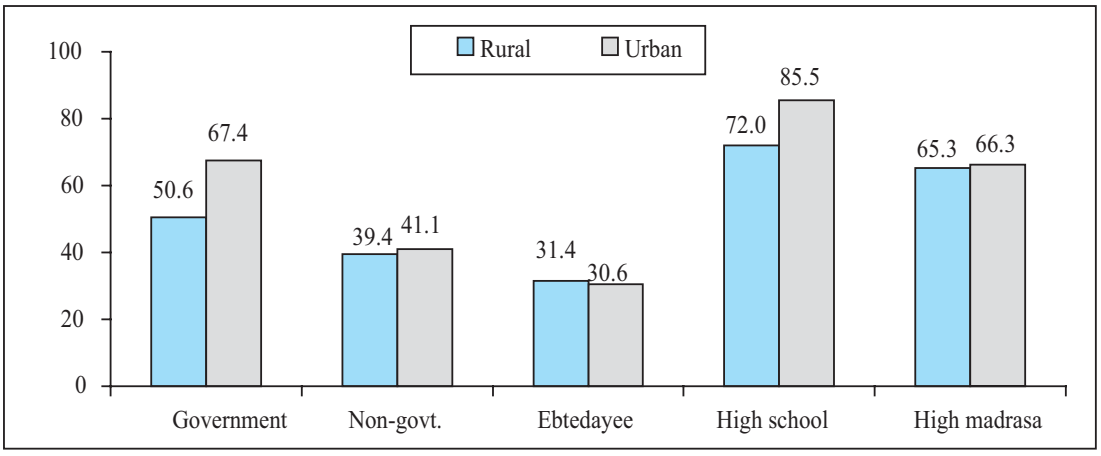

- Survival and completion rates and the coefficient of efficiency decreased during the past decade. Between 1998 and 2008, the survival rate decreased from 80.6% to 58.4% and the completion rate from 75.7% to 50.1%. The coefficient of efficiency was

76.3% in 1998 which reduced to 57.2% in 2008. All these clearly show a drastic fall in the efficiency of the primary education system in Bangladesh.

Students' achievement of competencies

The first and most rigorous outcome indicator of education provisions is the learning achievement of the students. The test instrument developed for the *Education Watch 2000* was used once again in 2008 to measure the progress over time. The instrument contained 27 of the 50 terminal competencies set for primary education. Tests were administered on the students of class V, just before completion of their primary education.

- Of the 27 competencies tested the students on an average, attained 16.1 competencies in 1998 which went up to 18.7 in 2008. Overall, increase was 2.6 competencies. Although the girls significantly lagged behind the boys in both the time and the rural students compared to their urban counterparts, improvements were noticed in all four groups of students. An equal rate of improvement was noticed in all three common types of schools covered in both the years (government, non-government and non-formal).

Progress in mean number of competencies achieved by the students

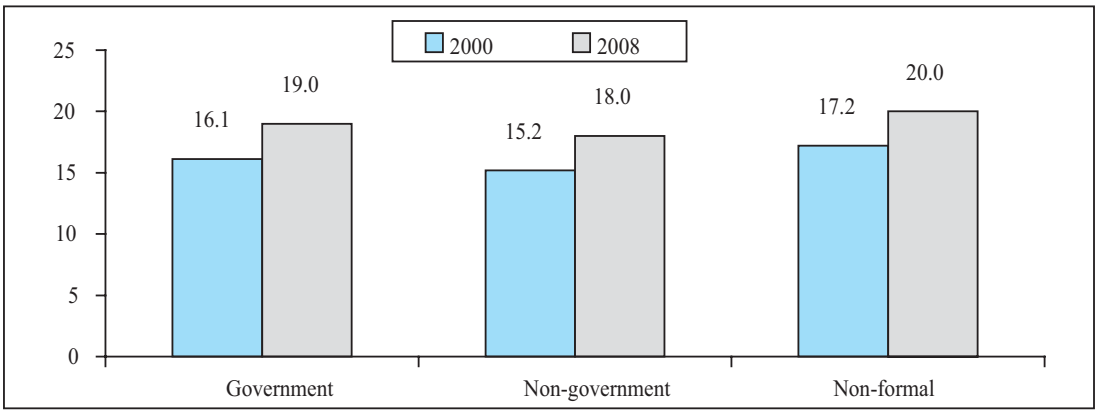

- In 2008, the students of the primary-attached high schools did the best in the test. The non-formal schools were the second, government schools third and the non-government schools fourth. The two types of madrasas were least successful. Gender difference disfavouring the girls was observed in the government and non-government schools and the high schools. Except for the

non-government schools, urban educational institutions of the other five types were significantly ahead of their rural counterparts.

Mean number of competencies achieved by school type, 2008

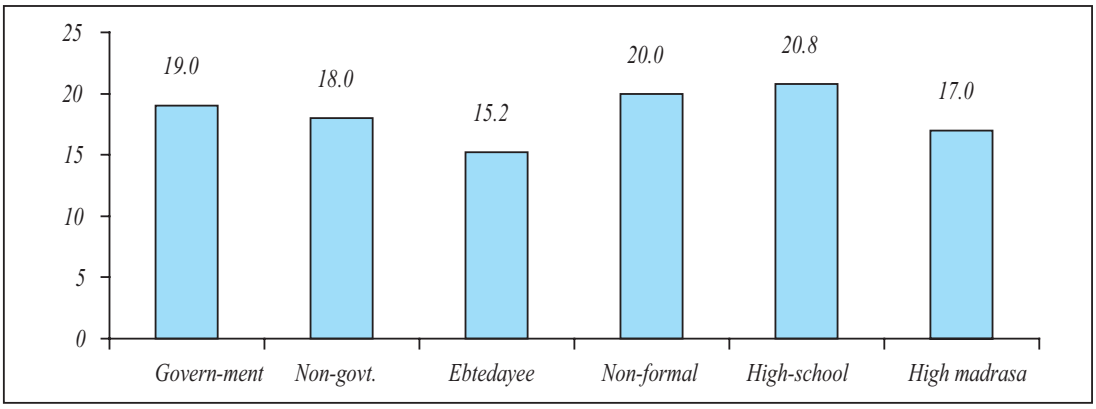

- The students in both the years, in general, did better in *Poribesh Porichiti* (both *society* and *science*) followed respectively by Bangla and mathematics. The worst performance was in English. The students of each type of schools performed better in the knowledge level items compared to those needing skills of higher order. Overall, improvement was more in the knowledge level items than the understanding level items. The students in both the years (2000 and 2008) found three competencies very difficult: writing in English, word problem solving in mathematics and life sketch of Prophet Mohammad (SM) or the preachers of own religion. There was a big jump in 'excellent' performance: in 2000, the students showed such performance in three competencies and 'satisfactory' in 12 but this went up to 12 and seven in 2008.
- Like the previous studies, this study confirms positive correlation between the students learning achievement with their socioeconomic characteristics, school related inputs and process factors. Of the three sets of variables, socioeconomic characteristics had the highest predictive power in order to explain variations in students learning achievement, followed respectively by additional educational inputs and school related input and process factors.

Education and literacy situation of population

Due to continuous efforts for primary and secondary education and progress made at school enrolment, a positive impact of these is

expected in the overall education and literacy situation of the country. This section draws on some of these issues from the four household surveys conducted under the *Education Watch*.

- Three measures were taken to understand the level of education of the population. Population ever schooled was estimated for among those six years and above, primary completers among those 11 years and above, and secondary completers among those 15 years and above. During the decade, mostly an equal amount of improvement was observed in the rates of ever schooled and primary education completed population. These were respectively 13.4 and 13.7 percentage points. The improvement in the population completing secondary education was much lower than the above – only 2.8 percentage points. In 2008, over two-thirds of the country's population was found to be ever schooled, more than a half completed primary education and 14.3% completed secondary education.

- During the decade, the females lagged behind the males and urban population surpassed their rural counterparts in all three indicators mentioned above but the rate of improvement was more among the females than the males and in the rural areas compared to the urban areas.

- Literacy rate of the population seven years and older increased from 37% in 2000 to 49.7% in 2005 and then slightly decreased to 48.5% in 2008. The adult (15 years and above) literacy rate was 41.6% in 2000 which increased to 52.6% in 2005 and then slightly decreased to 52.1% in 2008. None of the difference between 2005 and 2008 was statistically significant. Improvement in literacy rate from 2000 to 2005 was observed irrespective of gender and area. However, from 2005 to 2008, decrease was noticed only among the males. Age specific analysis shows a steady improvement only in four age-cohorts between 15-34 years.

- A consistent 20-22 percentage points gap between urban and rural areas was observed in the literacy rates throughout the decade. On the other hand, gender gap reduced over time. For population seven years and older, the gender gap reduced from 7.3 percentage points in 2000 to 3.9 percentage points in 2008. In case of adult literacy, it

reduced from 11.5 percentage points in 2000 to 7.1 percentage points in 2008.

Literacy rate of population 15-34y by age group and year

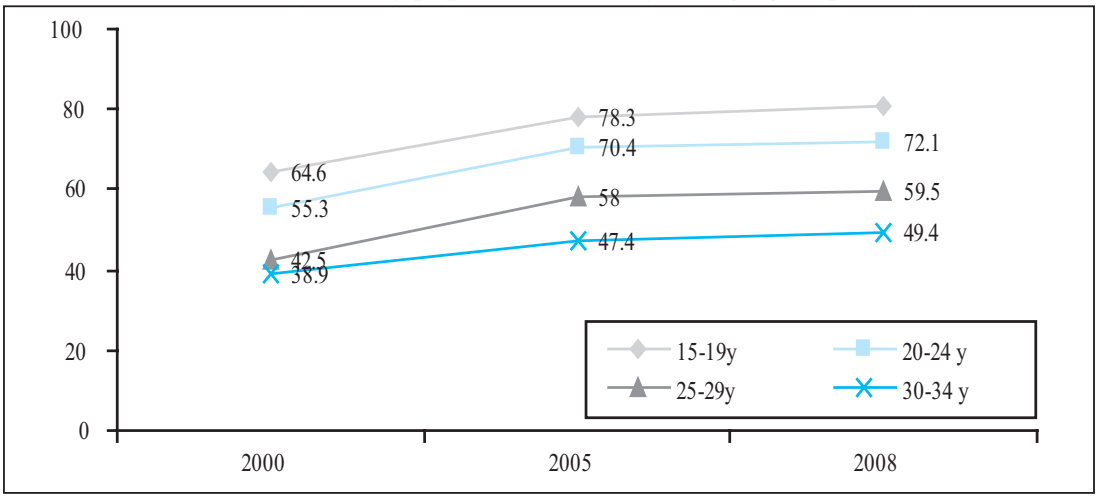

- Household with at least one literate person is often called as literate household. Sixty-one percent of the households had at least one literate person in 2000 which increased to 78% in 2005 and to 78.5% in 2008. Proportion of non-literate households reduced 17.5 percentage points during the last eight years – over two percentage points per year. In 2008, 89.4% of the urban and 76.5% of the rural households had at least one literate person.

Percentage of households with at least one literate person by year

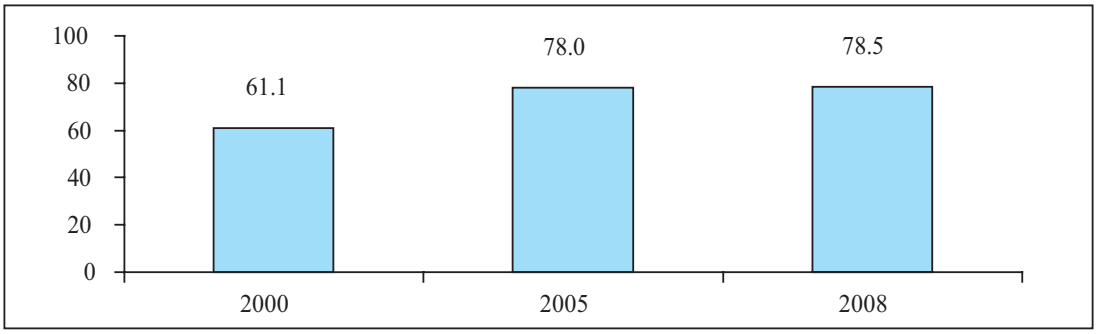

D. Conclusions and Recommendations

Primary education in Bangladesh is compulsory by law and according to the constitution the government is responsible to provide such education to all. Again, Bangladesh is committed to its people and the international community to provide quality primary education equally to all children so that they can complete the full cycle of primary education by 2015. A

number of initiatives have been taken since Jomtien conference by both the government and the non-government agencies so that the aims can be achieved. Introduction of competency based curriculum, provision of free textbook and stipend (*upabritti*) for the poorer students, recruitment of new teachers and providing them training and improvement of physical facilities under PEDP II are the initiatives taken by the government. In addition, setting up of non-formal schools offered a second chance to the poor and disadvantaged. Ten types of primary schools under various management bodies and curriculum, centralized government functionaries, overseeing only four types of schools by the key government authority (DPE) and having no coordination at the central or *upazila* level are some of the characteristics of primary education provision in Bangladesh. The country is proud of its high enrolment rate with gender parity but the literacy situation and overall quality of education are far below the expectations. A few years back, UNESCO warned through an annual 'EFA Global Monitoring Report' that Bangladesh would not be able to reach its EFA/MDG goals for 2015 with a "business as usual" approach. How much of this have been taken into cognizance is a pressing question. With this short introduction and the findings and analyses that have been presented the following key messages and policy recommendations are made.

Key messages from the study

Following are the key messages emanating from the findings of the present study:

The first message is that there is a huge wastage taking place in our primary education system. Half of the enrolled children drop out before completing the full five-year cycle. Owing to increase in dropout and repetition rates across all the primary classes, there is a visible drop in the retention and survival rates in recent years, which resulted in the shrinking of primary completion rate. Such high dropout indicates lack of quality provisions, loss of secure resources and thus inefficiency in the system.

The second message is that there is an indication of stagnation in enrolment since 2005. Improvement in primary enrolment was evident up to 2005 which stagnated afterwards due to a significant fall in enrolment

in some areas and among the children aged six years. Parents of half of such children thought that their wards were too young to enrol in school. Refusal of admission by the school authority, children losing interest in education, scarcity of money to meet the private cost of education, and disability were some of the major reasons for such a stagnant situation. Distance between home and school in some areas is another reason for the stagnation. This low net intake rate is a serious obstacle to achieving the second MDG.

The third message is that students' achievement of nationally determined competencies improved but it is far from expectation. Low achievements in the 'understanding level' items and inequities in terms of gender, school type and residence are some related issues linked to the quality of the system. Students' learning achievement depended much on their background characteristics and private tutoring than on the school related factors, which should be a wake-up call for the schools.

The fourth message is that the girls are ahead of the boys in terms of enrolment, attendance, survival up to class V and completion of the full cycle of primary education but are significantly behind when the question of learning achievement comes. This is true irrespective of school type. Females' participation in teaching profession increased significantly but their numbers are still low in the leadership of the institutions and participation in school managing committees.

The fifth message is that the madrasas are lagging behind in most of the quality indicators. Poor educational provision in these institutions is partly to blame for this. The ebtedayee madrasas which are basically independent institutions providing primary education is at the bottom of the league table. These institutions use separate textbooks and a majority do not have basic minimum infrastructure and learning facilities. Lack of trained teachers is a serious problem in the madrasas. Women's participation in teaching, school leadership and SMC is the lowest in madrasas.

The sixth message is that owing to continuous push for school enrolment, level of education and literacy status of the population increased over time. However, increase of ever schooled population and those who completed primary education was modest with a rate of 1.4 percentage

points per year. Although the literacy situation made important strides in recent times, it is yet to cross the 50% mark.

The seventh message is that the non-formal primary schools have been contributing significantly to achieving EFA. As supplementary and complementary to the mainstream education provision, it caters for 9.6% of total primary enrolments in 2008. Although these schools do not have enough physical facilities like the mainstream schools they are sometimes better endowed than other types in terms of educational software such as teacher training, teaching-learning provisions, child-friendly environment, teacher attendance and parental participation leading to better outcomes such as student attendance, cycle completion and learning achievements.

The eighth message is that physical facilities, teachers' education and training and learning provisions for the primary education system in Bangladesh have improved as a whole during the past decade. However, the improvement has been uneven. Madrasas and the non-government primary schools often lack basic minimum standards of enabling condition. There are shortcomings in the teachers' subject based training, management training of the heads of the institutions and effective functioning of the school managing committees. Dependence on private tutoring has increased over time.

Policy recommendations

The findings and the main messages of the *Education Watch 2008* study on the quality of primary education raise the following policy issues:

1. Primary education, wherever provided should, in principle, be *linked* with the Directorate of Primary Education (DPE) – the government's key authority to implement primary education. *Upazila* Education Offices, on behalf of DPE should play the principal role in coordinating primary education, of all types, at the *upazila* level. This implies decentralization of authority to the *upazila* level and making them accountable for access, equity and quality of education to the people of the respective *upazilas* and the Ministry of Primary and Mass Education.

2. There should be a 'minimum' provision of physical and learning facilities, qualified and trained teachers, co-curricular activities and

functioning school managing committee. All existing formal educational institutions including the madrasas should be judged on the basis of this standard and those not meeting the standards should receive direct support through government subvention. A yearly survey (like the *Education Watch*) should be carried out by the DPE to monitor improvements over time. Phase-wise five-year development plans may be considered. The learning process should take place in classrooms not private tutors' homes.

3. Pre-primary education should be confined for the children below age six. To ensure admission of children of age six in class I, campaigns of various forms should be considered, which, at the school level, can include school-catchment area based survey, meeting with the parents of non-enrolled children and community level campaigns. National and district level campaigns through all types of media such as radio, television, newspapers, mobile phones, bill boards, internet as well as folk media may be utilized. Some of these are already being used in some places; however, these need to be strengthened throughout the country for immediate action. The civil society should be utilized more in such campaigns.

4. In order to reduce distance/communication related barriers to school enrolment, non-formal primary schools should be promoted in the short run. Such provisions should be continued for those who missed primary education at age six and for the dropouts. The quality assuring mechanisms as practiced in non-formal schools, such as continuous training of teachers, supportive academic supervision, provision of co-curricular activities, community monitoring and special support to the disadvantaged and disabled students, can be adapted in the formal schools. Collaboration between DPE and the agencies implementing non-formal programmes through a *task force* could be considered as a public-private partnership (PPP) which is being promoted by the newly elected government.

5. We have reasons to be happy about the achievement of gender parity at participation level but there is no need to be complacent about it. Gender related issues should be addressed in teacher training, school management and day-to-day school operation.

Additional care, attention and encouragement can improve girls' competency achievements. More policy action is needed through *affirmative actions* to put more females as heads of the educational institutions including the madrasas and in the school managing committees.

6. Recognizing the contribution of madrasas in enhancing access to education, necessary facilities including unified and common set of standards for learning provisions, teaching personnel and core curriculum objectives and contents is a need of the hour. Additional support is needed for their improvement with adequate supervision and monitoring for the best use of the support.

7. The Compulsory Primary Education Act 1990 need to be revisited as it is inadequate to meeting modern day requirements. The Act is faulty as there is scope for the heads of the educational institutions to refuse admission without showing any reason; especially the disabled could be subjected to discriminations due to this. It is necessary to amend the Act towards achieving 'quality primary education for all' and vesting greater role, responsibility and authority to the *upazila* education offices.

8. In order to come out of the 'business as usual' approach, strong political commitment for a major overhaul in the education sector is required. 'Vision 2021' or the 'Digital Bangladesh' or any other developmental goals would be difficult to achieve without proper development of our human resources.

9. A large portion of the provision of 'block allocation' in the national budget 2009-10 can be utilized for education in addition to its usual allocation. Massive change in teacher education capable of impacting in classroom culture and school discipline, subvention to the schools and madrasas to create minimum standard of educational facilities towards reducing inequity among the educational institutions and establishing a strong monitoring mechanism should be the priority activities with this allocation.

The Contributors

Fazle Hasan Abed[1]
Dr. Qazi Kholiquzzaman Ahmad[1]
Brigadier General (Rtd) Aftab Uddin Ahmad[1]
Dr. Manzoor Ahmed[1]
Dr. Kazi Saleh Ahmed[1,5]
Zahin Ahmed[1]
Jasim Uddin Ahmed[3]
Prof. Kafil Uddin Ahmed[3]
Shyamoli Akbar[3]
Syeda Tahmina Akhter[3]
Dr. Mahmudul Alam[2]
Prof. Md. Shafiul Alam[3]
Md. Anwar Ali[3]
Prof. Muhammad Ali[3]
Mohammad Elias Ali[3]
Ruhul Amin[3]
Mahfuz Anam[1]
Prof. Ali Azam[3]
Dr. Anwara Begum[3]
Dr. Umme Salema Begum[3]
Dr. Abbas Bhuiyan[2]
Dr. A. M. R. Chowdhury[1,4]
Dr. Nazma Chowdhury[1]
Nabendra Dahal[1]
Hasina Habib[3]
Md. Azizul Haq[1]
Prof. M. Nazmul Haq[2]
K. M. Enamul Hoque[2]
Dr. M. Shamsul Hoque[3]
Md. Mofazzal Hossain[2]
Dr. M. Anwarul Huque[1]
Dr. Muhammad Ibrahim[1]
Prof. Md. Riazul Islam[3]
A. K. Mirza Shahidul Islam[3]
Roushan Jahan[1]
Hassan A. Keynan[1]
Nurul Islam Khan[2]
Dr. Abu Hamid Latif[1]
Jamal U. Mahmood[1]
Simeen Mahmood[2]
Dr. Imran Matin[2]
Dr. Ahmadullah Mia[2]
Mohammad Mohsin[2]
Samir Ranjan Nath[2,4]
Abdur Rafiq[2]
Kazi Fazlur Rahman[1]
Jowshan Ara Rahman[1,5]
M. Habibur Rahman[2]
Dr. Siddiqur Rahman[2]
A. N. S. Habibur Rahman[3]
Dr. M. Matiur Rahman[3]
Md. Fazlur Rahman[3]
A. N. Rasheda[1]
Taleya Rehman[1]
Goutam Roy[3]
Dr. Md. Abdus Sattar[3]
Dr. Qazi Shahabuddin[1]
Sabbir Bin Shams[2]
Prof. Rehman Sobhan[1]
Mohiuddin Ahmed Talukder[2]
Mohammad Muntasim Tanvir[2]
A. M. M. Ahsan Ullah[3]

1. Advisory Board member
2. Working Group member
3. Technical Team member
4. Study Team member
5. Review Team member